নব-বিধান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

একাদশ মুদ্রণ
কার্ত্তিক—১৩৬৪

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নব-বিধান

১

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল পত্নী-বিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার সূচনাতেই যদি না বন্ধু-মহলে একটু বিশেষ রকমের চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া যাইতেন ত এই ছোট্ট গল্পের রূপ এবং রঙ বদ্‌লাইয়া যে কোথায় দাঁড়াইত, তাহা আন্দাজ করাও শক্ত। সুতরাং ভূমিকায় সেই বিবরণটুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক—বিলাতি ডিগ্রি আছে। বেতন আট শত। বয়স বত্রিশ। মাস-পাঁচেক পূর্বে বছর-নয়েকের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস। বাড়ির মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা-বাবুর্চি, সহিস-কোচমান প্রভৃতিতে প্রায় সাত-আট জন চাকর। ধরিতে গেলে সংসারটা এক রকম এই সব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিল না। ইহা স্বাভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুয্যের মেজমেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ

করিয়াছে এবং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহলও সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন, তথাপি সেদিন সন্ধ্যা-কালে শৈলেশেরই বৈঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া পড়িল। তাহার বন্ধু সমাজের ঠিক ভিতরের না হইয়াও একজন অল্প বেতনের ইস্কুল পণ্ডিত ছিলেন। চা-রসের পিপাসাটা তাঁহার কোন বড়-বেতনের প্রফেসারের চেয়েই ন্যূন ছিল না। পাগ্‌লাটে গোছের বলিয়া প্রফেসররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া ডাকিতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিত না, তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিত না। দিগ্‌গজ নিজে ইংরাজি জানিত না, মেয়েমানুষে এক্‌জামিন পাশ করিয়াছে শুনিলে রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত! ভূপেন-বাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন, আবার বিয়ে? সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ে দোষটা করলে কি শুনি! ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়িতেই আনুন—আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোনমতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ।

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁস থাকিত

না, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সব্বাই ? আমাকেও লোকে পাগল বলে—তাই বলে আমি পাগল !

সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িল না। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিতমুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত unfortunate ব্যাপার। বিলাত যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়িতে রাখতেও পারেন নি। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখি নি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিল, ওহে দিগ্‌গজ ! বুদ্ধিমান্‌ ! তা না হ'লে কি তাঁরা এক-বার পাঠাবার চেষ্টাও করতেন না ? চায়ের মজলিসে গরহাজির ত কখনো দেখলুম না, কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে এ আশা আর করবো না। গঙ্গাজল আর গোবরছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখলুম !

দিগ্‌গজ জোর করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না !

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেন না। ইহার পরে সাধারণ গোছের দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রায় এম্‌নি সময়েই প্রত্যহ সভাভঙ্গ হয়, হইলও তাই। কিন্তু আজ কেমন একটা বিষণ্ণ, ম্লান-ছায়া সকলের মুখের পরেই চাপিয়া রহিল—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিল না।

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়া গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না, অপর-দিকে তেমনি লজ্জারও অবধি রহিল না। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠারো বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী উষার বয়স তখন মাত্র এগারো। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালিপদবাবু অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে এক প্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেন না। ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন। অযাচিত, কোন মতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না, শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল বাড়ি গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর-চারেক পরে যখন যথার্থ-ই বাড়ি ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদ্‌লাইয়া গেছে। অতএব আর একজন বিলাত-ফেরতের বিলাতি আদব-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন

বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে শৈলেশের পিতা কালিপদবাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এত কালের মধ্যে ও-বাড়ির কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া দিন কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগ্‌লামিতে ভায়েরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে, কেবল, একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয় না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাস মাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বিশেষতঃ সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার এক-মাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপে বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ি শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে

২

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়া গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না, অপর-দিকে তেম্‌নি লজ্জারও অবধি রহিল না। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠারো বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী উষার বয়স তখন মাত্র এগারো। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালিপদবাবু অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে এক প্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেন না। ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন। অযাচিত, কোন মতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না, শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল বাড়ি গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর-চারেক পরে যখন যথার্থ-ই বাড়ি ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদ্‌লাইয়া গেছে। অতএব আর একজন বিলাত-ফেরতের বিলাতি আদব-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন

বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে, শৈলেশের পিতা কালিপদবাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালংকারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এত কালের মধ্যে ও-বাড়ির কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা, গংগাজল ও গোবর লইয়া দিন কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগলামিতে ভায়েরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে, কেবল, একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয় না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাস মাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বিশেষতঃ সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার এক-মাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপে বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শংকায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ি শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিস্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে

লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এম্‌নি করিয়া তাহার শোধ দিল।

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ। তাই সত্যকার লজ্জার চেয়ে চক্ষুলজ্জাই তাহার প্রবল ছিল। বিদ্যাভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার এই ছিল যে, সে জ্ঞানতঃ কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারে না। বন্ধুরা মুখে না বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে, ইহা বুঝিতে বাকি ছিল না—এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে পাঠাইলেই ত সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমতঃ সে আসিবে না। যদি বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে দু'দিনেই আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই দু-পাঁচ দিন সোমেনকে তাহার পিসির বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা-ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল! এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই ত ঠিক।

কলেজ হইতে সে সাতদিনের ছুটী লইল। এলাহাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের যাওয়ার কথা তাঁহাকে তার করিয়া দিল, এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নন্দীপুর হইতে উষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত সে যেন

আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন-সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাতো ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী অফিসে চাকুরী করিত। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, ভুতো, তোকে কাল একবার নন্দীপুরে গিয়ে তোর বৌদিকে আনতে হবে।

ভুতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিদিটা আবার কে?

তুই ত বরযাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভটচায্যির বাড়ি?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনি নে, তিনি আসবেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল, না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আসবে না বললেই ফিরে আসবি।

ভুতো আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাবো। কিন্তু মার-ধোর না করে।

শৈলেশ তাহার হাতে খরচ-পত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেণে আমি এলাহাবাদে যাচ্চি। সাত দিন পরে ফিরবো। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভুতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন মেজদা? খাল খুঁড়ে কুমীর আনছ না ত?

শৈলেশ চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আস্‌বে না নিশ্চয়। কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত! শ্যামবাজারে একটা খবর দিস্‌! সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পাঞ্জাব মেলে শৈলেশ্বর এলাহাবাদ চলিয়া গেল।

৩

দিন-কয়েক পরে একদিন দুপুর-বেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল, এবং মিনিট-দুই পরেই একটি বাইশ-তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সৌমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যাল্‌বাম হইতে তাহার নূতন মাকে ছবি দেখাইতেছিল; সে-ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসিমা।

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরণে নিতান্ত সাদা-সিধা একখানি রাঙা-পেড়ে শাড়ী, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই-একখানি গহনা কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক্‌ হইল।

প্রথমে ঊষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসিমাকে প্রণাম কর্‌লে না বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। ঊষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে ঠাকুরঝি, ব'সো?

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

ঊষা বলিল, সোমবারে এসেছি, আজ বুধবার—তা হ'লে তিন দিন হল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হবে কেন ভাই, ব'সো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ি হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার—ঢের কাজ! সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রুক্ষতার জবাব ঊষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি ক'রে থাক্‌বো ভাই? সেখানে বৌয়ের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ একজন কাছে না থাকলে ত আমি বাঁচি নে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেছেন আমার ওখানে গিয়ে থাক্‌তে। আমার নষ্ট করবার সময় নেই সোমেন—যাও ত শীগ্‌গির কাপড় পরে নাও; আমাকে আবার একবার নিউমার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দুজনের মাঝখানে পড়িয়া সোমেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসিমা? তাহার বিপদ দেখিয়া ঊষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করছি নে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়িতে আমার কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিল না, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্যে দিয়া আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে ঊষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায় না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

উষার ঠোঁটের কোণ দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত ঠিক করে উঠতে পারি নে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ। ও বোঝেই বা কতটুকু। আর অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুল্‌লে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেচি, এ সব আমি সামলাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা হলে চিঠি লিখে দেবো?

উষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে, তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার কলকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড়। এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পাবে না। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বস্‌লে না পর্য্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৌদিদির কাছে এসে বস্‌বে, এ কথাও আজ তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিল না, কহিল, আজ আমার

সময় নেই—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল বারান্দায় রেলিঙ্ ধরিয়া ঊষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৪

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ-দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুর-বেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখের নিচের বারান্দায় বসিয়া সোমেন কতকগুলা কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্রই সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্ট ভাবে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনও সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইল। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, ও সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এক কথায় ফাঁস করিল না, বলিল, তুমি বল ত বাবা, ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি ক'রে জান্‌ব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ।

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপে কি হবে?

ইহার অদ্ভূত বিবরণ সোমেন আজ সকালেই শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যা-বেলা উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙাতে হবে বাবা। মা বলেন, আমার ঠাকুর্দ্দারা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টান মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করেন! যত সমস্ত কুসংস্কার—যা পড়গে যা বল্‌চি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছত্রাকার হইয়া পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপরে কোথা হইতে মিষ্ট কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবা সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও ভাল একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দেব, তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেশ কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীর বিরক্ত মুখে তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হইল—টুন্ টুন্ টুন্ টুন্। কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল?

আবদুল আসিল না।

গিরধারী। গিরধারী!

গিরধারীর পরিবর্ত্তে বাঙালী চাকর গোকুল গিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে—

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিল, আজ্ঞে? ব্যাটারা মরেছিস্?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কই?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটী দিয়েছেন, সে বাড়ি গেছে।

ছুটি দিয়েছেন! বাড়ি গেছে! গিরধারী কোথা গেল?

গোকুল জানাইল সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে।

শৈলেশ স্তম্ভিত হইয়া কহিল, বাড়িতে কি লোকজন কেউ আর নেই নাকি?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে, আর সবাই আছে।

তাই বা আছে কেন? যা দূর হ—

শৈলেশ্বর নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া রাখিল; আলনা হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে সেটা নিচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; নেকটাই, কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখে টেবিলের উপর একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল —মলাটে লেখা, সংসার খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল মেয়েলি অক্ষরের চমৎকার স্পষ্ট লেখা! দৈনিক খরচের অংক—মাছ এত, শাক এত, চাল এত, ডাল এত—হঠাৎ দ্বারের পর্দ্দা সরানোর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল কে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে আর যেই হোক দাসী নয়, তাহা চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া

প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এত বেলায় আবার চা খাবে না কি! কিন্তু তা হ'লে আর ভাত খেতে পারবে না!

ভাত খাবো না।

না খাও, হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান ক'রে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক ক'রে আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেচি। চল।

এখন থাক।

ওগো আমি উষা—বাঘ-ভালুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি ছি করবে না।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ-ভালুক?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্চো কেন?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সংগে ঝগড়া কর্‌লে কেন?

উষা কহিল, ও তোমার বানান কথা, তোমাকে সে কখ্‌খনো লেখে নি, আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েছ কেন?

কে বলেচে তাড়িয়েছি? সে এক বছরের মাইনে পায় নি, সে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল; আমি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েচ? তা হ'লে সে আর আস্‌বে না। গির্‌ধারী গেল কেন?

উষা কহিল, এ ত তোমার ভারি অন্যায়। চাকর-বাকরদের

মাইনে না দিয়ে আটকে রাখা—কেন, তাদের কি বাড়ি-ঘর-দোর নেই না কি? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বশিষ্ট মুনির আশ্রম বানিয়ে তুলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই চমকিয়া কহিল, এটা কি? চারশ ছ টাকা—

উষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েচি। এখনো বোধ করি শ-দুই আন্দাজ বাকি রইল, বলেচি আসচে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক্ হইয়া বলিল, ছ'শ টাকা মুদির দোকানে বাকি?

উষা হাসিয়া কহিল, হবে না? কখনো শোধ করবে না, কখনো হিসেব দেখতে চাইবে না—কাজেই দু-বচ্ছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দু বচ্ছরের হিসেব দেখলে নাকি?

উষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িতেছে, একথা এই পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও উষার চিনিতে বাকি রহিল না, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচো বল ত?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাবচি টাকা যা ছিল, সব ত খরচ করে ফেললে, কিন্তু মাইনে পেতে যে এখনো পনর-ষোল দিন বাকী?

উষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলে-মানুষ যে, সে হিসেব আমার নেই? পনর দিন কেন, এক মাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসব না! কিন্তু কি কাণ্ড ক'রে রেখেছ বল ত? গোয়ালা বলছিল তার প্রায় দেড়শ টাকা পাওনা। ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জ্জি'র দোকানে যে কত পড়ে আছে, সে শুধু তারাই জানে। আমি আজ হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বল্‌বে কি, কি—দেবে কোথা থেকে?

উষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল একেবারেই দিতে পারবো তা ত বলি নি, আমি তিন-চার মাসে শোধ করবো। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখো নি? আমাকে লুকিয়ো না।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিম্‌লা যেতে একজনের কাছে হ্যাণ্ডনোটে দু হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারি নি।

উষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখছি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবে না! কিন্তু আর কিছু নেই ত?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু আমি ত ভেবেছি, এ জন্মে ও আর শোধ দিতে পারব না।

উষাতু কহিল 'মি কি সত্যিই কখনো ভাবো?

শৈলেশ বলিল, ভাবি নে? কতদিন অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে যেন দম আট্‌কে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমাকে তুমি ভুলিয়ো না। যথার্থ-ই কি আশা কর শোধ কর্‌তে পার্‌বে?

ঊষার চোখের কোণ সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহারই জন্য হৃদয়ে সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েছে, শোধ দিতে হবে না? কিন্তু এই কটা টাকা দিয়ে ফেল্‌তে আমার কদিন লাগবে!

সকলের বড় কষ্ট হবে—

ঊষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবে না কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল অনেক দিনের মেঘলা আকাশের কোন্ একটা ধার দিয়া যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

৫

খাম ও পোষ্টকার্ডে বিস্তর চিঠি-পত্র জমা হইয়াছিল, সেই সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এম্‌নি সব ছোট-খাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাহার কর্ম্ম-নিরত, একাগ্র

মুখের চেহারা বাহির হইতে পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে, এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ি লোকের মনের মধ্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এ ক্ষেত্রে এই-টুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, অধ্যাপক বলিয়াই যে সংসারে ছলনা করার কাজে হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশ্বর নিজেই সুইচ্ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। যেন তাহার নষ্ট করিবার মুহূর্ত্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ কুকর্ম্ম করিতে পূর্ব্বে তাহাকে কোন দিন দেখা যাইত না।

এইরূপে যখন সে অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে, পর্দ্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে, আসুন।

শৈলেশ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ ত আমার খাবার সময় নয়! এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে তুলে রাখতে বলে দেব?

শৈলেশ কহিল, তুলে রাখাই উচিত। আবদুল না থাকাতেই এই সময়ের গোলযোগ ঘটেছে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিল, সমস্ত তোলা-তুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বল গে আমি যাচ্চি।

আজ খাবার-ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত নয়, উপরে আসিয়া দেখিল তাহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাশ বাটি প্রভৃতি মাজা ধোয়া হইয়া বাহির হইয়াছে—থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য্য থরে থরে সজ্জিত, অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ঊষা, এবং তাহাকে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিল, তোমাকে ত সংগে খেতে নেই আমি জানি, কিন্তু সোমেন? তাকেও খেতে নেই নাকি?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, কহিল, আমি রোজ মার সংগে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এত সব রাঁধলে কে? তুমি নাকি?

ঊষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিল, বামুনটাও নেই বোধ হয়; যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকি ছিল না—তাকে কি তা হ'লে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদেয় করলে?

ঊষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হ'লে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকি রাখ্‌লেই চলে না। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, থাক্‌। তাকে দেখবার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠি নি, তাকেও মাঝে

মাঝে রাঁধতে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তাহা সেই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন—হঠাৎ সেই দিনের কথা তাহার মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিল, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েচে। গোঁসাইরা মাংস খায় না, তারা কাঁটালের তরকারিকে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁটা বলে খায়। আমার রুচিটা ঠিক অতখানি উচ্চ জাতীয় নয়। তাই কাঁটাল বরঞ্চ আমার সইবে, গাছ-পাঁটা সইবে না।

ঊষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিল না, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁটা কি মা ?

প্রত্যুত্তরে ঊষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ !

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিল, না, চারপেয়ে পাঁটাই বটে, চমৎকার হয়েছে, কিন্তু এ রান্না তুমি শিখলে কি করে ?

ঊষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে ? আমার বাবা ছিলেন সিদ্ধেশরীর সেবায়েৎ, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাই-বাড়ি থেকে আসচি ?

শৈলেশ কহিল, এই এক বাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য। কিন্তু আমার ত সিদ্ধেশ্বরী নেই, এ কি প্রতিদিন জুটবে ?

ঊষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি ?

শৈলেশ কহিল, আবদুলের শোক ত আমি আজই তোল্‌বার যো করেচি, দেনা—

ঊষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে, স্বামী পুত্রকে না খেতে দিয়ে আমি দেনা শোধ কর্‌ব ? দেনার কথা তুমি আর মুখেও আন্‌তে পাবে না বলে দিচ্চি।

শৈলেশ কহিল, তোমাকে বলে দিতে হবে না, দেনার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

ঊষা বলিল, এতে কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত দেনা হয় নি।

কিসের জন্য যে হ'ল কিছুই ত জানি নে ঊষা—

ঊষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই। দয়া ক'রে এইটি শুধু ক'রো পাগল বলে আবার যেন নির্ব্বাসনে পাঠিয়ো না।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিল। সোমেন কহিল, খাবে চল না মা ! কালকের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করলে মা ?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখছি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

ঊষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিল, এর কারণ কি জান ?

উষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলেমানুষ একলা বাড়িতে—

তা বটে, কিন্তু মা থাক্‌লেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায় নি।

উষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আন্‌তে বলে দি। আচ্ছা, না খাও—আমার মাথা খাও, মেঠাই দুটো ফেলে উঠো না কিন্তু। সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া উষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্য এই পীড়াপীড়ি, এম্‌নি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্যি দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলে-বেলায় শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের একছেলে—অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিল না। ভাঙিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কোন দিকের কোন হিসেবই আর আমি করব না উষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল, শৈলেশ ঠাহর পাইল না। সকালে উঠিয়াই উষা কহিল, তোমাকে রোজ বল্‌চি কথা শুন্‌চো না—যাও আজ ঠাকুরঝির ওখানে। সে কি মনে করচে বল ত? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যি সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে না কি!

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিল, কলেজের যে রকম কাজ পড়েচে—

উষা বলিল, তা আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠ্‌তে পারলে না।

কিন্তু কি রকম শ্রান্ত হয়ে ফিরতে হয়, সে ত জান না? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয় না।

উষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি আজ একবার যাও, রবিবারেও ছেলে পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর আমার মুখ দেখ্‌বে না। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ি তৈরি করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজারে পেঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস। গাড়ীতে আমার কাজ আছে।

যাইবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে সে বিমাতার গায়ে ঠেস দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমার কাছে যাইতে সে কোন দিনই উৎসাহ বোধ করিত না, বিশেষতঃ সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার

ভয়ের অবধি রহিল না। উষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক, না-হয় আর একদিন যাবে।

শৈলেশ কহিল, বিভার ওখানে যে ও যেতে চায় না, সে দেখ্‌চি তুমি টের পেয়েছ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ি ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাঁহার সতের-আঠার বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিল না। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই আসিল। উষার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া এতগুলি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লীগ্রামের কুশিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্ত করিয়া দিবে এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্যন্ত সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারম্বার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে, তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাকে পুনরায়

গ্রহণ করা কিসের জন্য ? সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবে না, কোথাও কোন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে সংগে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবে না, এমন কি বড় ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া ?

অপরিচিত উষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই-একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান বলে, গিরিধারীকে দূর করলেন ছোট জাত বলে। এত যাঁর জাতের বিচার তাঁর সংগে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বৌকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারব না, তা যিনিই কেন না যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল, তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে, ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বৌদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে না দিতেই তাহারা পলাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি ? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমার এখন চলে কি করে ?

শৈলেশ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, এম্‌নি একরকম যাচ্চে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আস্‌বে না, আমি বেশ জানি। বাড়ি ত একেবারে ভট্‌চায্যি-বাড়ি করে রাখলে চল্‌বে না, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখে-শুনে রাখে—মানুষে বলবে কি ?

শৈলেশ কহিলেন, না চল্‌লে রাখতে হবে বই কি !

বিভা বলিল, কি ক'রে যে চল্‌চে সে তোমরাই জানো আমরা ভেবে পাই নে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বাপের বাড়ি না গিয়েও পারি নে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবে না।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাইবোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও, তখন না হয় ব'লো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিন তাঁর ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেছি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারে সত্য নয়, বস্তুতঃ, সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না তাহা উভয়ের কেহই জানিতেন না। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ ব্যাপার কি তোমাদের ? চাকর-বাকর সমস্ত

বিদায় ক'রে দিয়ে কি বোষ্টম-বৈরাগী হয়ে থাকবে না কি? আজকাল খাচ্চো কি?

শৈলেশ কহিল, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গলচে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাধচে না এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, ঠিক তা আমিও জানি, এবং আমারও যে সত্যি-সত্যিই বাধে তাও নয়—কিন্তু মজা এমনি যে সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার যো নেই। তুমি কি এমনিই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ না কি?

শৈলেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, দেখ ক্ষেত্র, যথার্থ কথা বলতে কি, স্থির আমি নিজে কিছুই করি নি, করবার ভারও আমার পরে তিনি দেন নি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেছি যে তাঁর অমতে তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চি নে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবে না, তা বলে দিচ্ছি!

শৈলেশ কহিল, এ দিকে যদি রক্ষা নাও থাকে, অন্য দিকে একটু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবে না। বল কি হে, অহর্নিশি কেবল টাকার ভাবনা, মাসের পোনরটা দিন পার হ'লেই মনে হয় বাকি পোনরটা দিন পার হবে কি করে—সে পথে আর পা বাড়াচ্চি নে। আমি বেঁচে গেছি ভাই—টাকা ধার করতে আর যেতে হবে না। যে

কটা টাকা মাইনে পাই, সেই আমার যথেষ্ট, এ সুখবরটা এঁর কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল না কি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেছি, সে খবর ত রাখো না!

শৈলেশ বলিতে লাগিল, এলাহাবাদে পালাবার সময় পুরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই একটি মাস পুরো চলা চাই। আগে ত কোন কালেই চলে নি, সোমেনের মা বেঁচে থাকতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এঁর হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়েও চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিলেন, তাদের মুসলমান এবং ছোটজাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানি নে, কিন্ত এটা জানি যাবার সময়ে তারা এক বছরের বাকি মাইনে নিয়ে খুব সম্ভব খুসি হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চারশ টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও ছোট-খাটো কি কি সাবেক দেনা শোধ করে ছোট একখানি খাতায় সমস্ত কড়ায়-গণ্ডায় লেখা—ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো ঊষা, অর্দ্ধেক মাস যে এখনো বাকি—চলবে কি ক'রে? জবাবে বললেন, আমি ছেলেমানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে একতিল পাই নি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত, আমার দর্জ্জি ও কাপড়ের বিল এবং

হ্যাণ্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক্ ভাই, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত পথটা ক্ষেত্রমোহন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কাহারও কোন কথা বোধ করি তাঁহার কানেই গেল না।

৭

অল্প কিছুক্ষণেই গাড়ী আসিয়া শৈলেশ্বরের দরজায় দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সাক্ষাৎ মিলিল সোমেনের। সে কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাঠে বসিয়া তাহার রেল-গাড়ির চাকা মেরামত করিতেছিল—তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্দ্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা শাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম সীতা পর্য্যন্ত সর্ব্ব-প্রকার দেব-দেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ দেখিয়েছে বাবা, বেঁচে থাকো!

শৈলেশের এই দুজনের কাছে যেন মাথা কাটা গেল।

স্বভাবতঃ সে মৃদু প্রকৃতির লোক, যে কোন কারণেই হোক্‌, হৈ-চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিত না, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোথা থেকে এই সমস্ত ক'রে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌ গে যা বল্‌চি!

তিনজনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়েরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর, মিনিট-খানেক কেহই কোন কথা কহিল না, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে এতটা বাড়াবাড়ি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্বে বলিতে লাগিল, এসব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য।

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে একেবারে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে ফেল্‌লে হে! ছেলেটাকে মারলে কি বলে! তোমাদের সঙ্গে ত চলা-ফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চায়ের পেয়ালায় তুফান কি রকম? তুমি কি এটাকে ছেলে-খেলা মনে করলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ, ভয়ানক কিছু একটা যে মনে হচ্চে না তা অস্বীকার করতে পারি নে।

তার মানে?

মানে খুব সহজ! আজ নিশ্চয় কি একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি মহাপাপ হ'তে পারে আমি ত ভেবে পাই নে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপারও খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পাণ্ডা আছে, হয়ত কেউ দুটো একটা পয়সার আশায় ছেলেমানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েছে। এতে খুনোখুনি কাণ্ড করবার কি আছে!

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, এর পরিণাম ভেবে দেখেচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকাল-বেলা মুখ-হাত ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র! তোমার ছেলে-পুলে থাকলে তুমিও তা হলে এই রকম করতে দিতে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলে-পুলে যখন নেই, তখন এ তর্ক বৃথা!

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক বৃথা হ'তে পারে, চন্দনও ধুয়ে ফেললে উঠে যায় আমি জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত

অত সহজে নাও উঠ্‌তে পারে। ছেলে-পুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চেয়েই কাজটা কর্‌তে হয়। আজকার কাজ যে অত্যন্ত অন্যায় এ কথা আমি একশ বার বল্‌ব, তা তোমরা যাই কেন না বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নও—একা আমি! শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে—আমি কিন্তু এ আশা করি নে যে অধ্যাপকবংশের মেয়ে এসে একদিনেই মেম-সাহেব হয়ে উঠ্‌বে। তা সে যাই হোক্‌, তোমরা দু-ভাই-বোন এর ফলাফল বিচার করতে থাকো, আমি উঠ্‌লুম।

শৈলেশ চুপ করিয়াই ছিল, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্র কহিলেন, উপরে। ঠাক্‌রুণের সঙ্গে পরিচয়টা একবার সেরে আসি। কথা কন কিনা একটু সাধ্য-সাধনা করে দেখি গে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতে ডাক দিয়া কহিলেন, বৌঠাক্‌রুণ নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ বাড়াইতেছিল, কহিল, পিসেমশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটা-দুই আলমারীর কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য রকমের কাপড় জামা শাড়ি জ্যাকেট

কোট পেণ্টলান মোজা টাই কলার—কত যে রাশিকৃত করা তাহার নির্ণয় নাই, ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনার হচ্চে কি ?

সোমেন স্তূপের মধ্যে হইতে একজোড়া মোজা টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এই আর একজোড়া বেরিয়েচে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া—চেয়ে দেখ মা ?

ঊষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃংখলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এ কি অনাথ আশ্রমের ফন্দ' তৈরি হচ্চে, না জঞ্জাল পরিষ্কারের চেণ্টা হচ্চে ? কি করচেন বলুন ত ? তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ তাঁহাকে দেখিয়া হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু ঊষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইল না। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজ কণ্ঠেই দিল, কহিল, এগুলো সব সারভে পাঠাবো ভাবছি। কেবল মোজাই এত জোড়া আছে যে বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনলেও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুণ এখন কেউ নেই, এই সময় চট্ করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তার স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেন না। বাইরে থেকে আমার সাজ-সজ্জা আর আচার-ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেন না, আমি নিতান্তই বাঙালী। কেউ গঙ্গাস্নান করে এসেছে শুনলে তাকে

আমার মারতে ইচ্ছা করে না এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখ্‌লাম।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আরও একটা কথা নিরিবিলিতেই বলে রাখি। সোমেনের মারটা নিজের গায়ে পেতে নিলে শৈলেশ বেচারার প্রতি কিন্তু অবিচার করা হবে। এত বড় অপদার্থ ও সত্যি-সত্যিই নয়।

ঊষা এ কথারও কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন। আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী-হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম একটু শিখে নিই।

ঊষা মেঝের উপর বসিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, এ সব মেয়েদের কাজ আপনার শিখে লাভ কি ?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব আর একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

ঊষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই কহিল, এ সব ত গরীব-দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষার ত কোন প্রয়োজনই হবে না।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুণ, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারও ভুল হয় ত সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব্যথা বোঝবার আর কেউ থাক্‌বে না। ইচ্ছে করে আমার ছোট বোনটিকে আপনার কাছে দিন-কতক

রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মী-শ্রীর কতকটাও হয়ত সে তাহলে শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

উষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নিচে শুনিতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আসচেন দেখচি। শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ দেখে কিন্তু ভিতরটাও এক রকম বলে স্থির করে নেবেন না।

উষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিনতে পারব।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয়? নিশ্চয় পারবেন এও আমি নিশ্চয় জানি।

৮

সিঁড়িতে যাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়াছিল, তাহারা শৈলেশ, বিভা এবং বিভার ছোট ননদ উমা। শৈলেশ ও বিভা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সকলের পিছনে ছিল উমা; সে চৌকাঠের এদিকে পা বাড়াইতেই, তাহার দাদা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, জুতোটা খুলে এস উমা।

বিভা ফিরিয়া চাহিয়া স্বামীকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, দোষ কি? পায়ে কাঁটাও ফুটবে না, হোঁচট্‌ও লাগবে না।

বিভা কহিল, সে আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ জুতো খোলায় দরকার হ'ল কিসে তাই শুধু জিজ্ঞেসা করেচি।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুণ হিঁদু মানুষ—তা ছাড়া গুরু-জনের ঘরের মধ্যে ওটা পায়ে দিয়ে না আসাই বোধ হয় ভাল।

বিভা স্বামীর পায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল শুধু কেবল ভগিনীকে উপদেশ দেওয়াই নয়, নিজেও তিনি ইতিপূর্ব্বে তাহা পালন করিয়াছেন। দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, গুরুজনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা তোমার অসাধারণ। সে ভালই, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। গুরুজনের এটা শোবার ঘর না হয়ে ঠাকুরঘর হ'লে আজ হয়ত তুমি একেবারে গোবর খেয়ে পবিত্র হয়ে ঢুকতে।

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া ক্ষেত্র হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, গোবরের প্রতি রুচি নেই, ওটা বৌঠাকরুণের খাতিরে মুখে তুলতে পারতুম না, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যখন কোন সুবাদই রাখি নে, তখন অকারণে তাঁদের ঘরে ঢুকেও উৎপাত করতুম না। আচ্ছা, বৌঠাকরুণ, এ ঘরে ত আগেও বহুবার এসেচি, মনে হচ্চে যেন একটা ভাল কার্পেট পাতা ছিল, সেটা তুলে দিলেন কেন?

ঊষা কহিল, ধোয়া-মোছা যায় না, বড় নোঙরা হয়। শোবার ঘর—

বিভা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কার্পেট পাতা থাকলে ঘর নোঙরা হয়?

ঊষা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, হয় বই কি

ভাই! চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু নিচে তার ঢের ধুলো-বালি চাপা পড়ে থাকে।

বিভা বোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবল কণ্ঠে অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ব্যস্, ব্যস্, বৌঠাকরুণ, নোঙ্‌রা চাপা পড়্‌লেই আমাদের কাজ চলে যায়—তার বেশি আমরা চাই নে। ও জিনিসটা চোখের আড়ালে থাকলেই আমরা খুসি হ'য়ে থাকি। কি বল শৈলেশ, ঠিক না?

শৈলেশ কথা কহিল না। বিভার ক্রোধের অবধি রহিল না; কিন্তু সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সে তর্ক না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকার স্নেহ ও প্রীতির হয়ত কোন অভাব ছিল না, কিন্তু বাহিরে সাংসারিক আচরণে বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত! লোকের সম্মুখে বিভা তর্কে কিছুতেই হার মানিতে পারিত না ইহা তাহার স্বভাব। এই হেতু প্রায়ই দেখা যাইত, এই বস্তুটা পাছে কথায় কথায় বাড়াবাড়িতে গিয়া উপনীত হয়, এই ভয়ে প্রায়ই ক্ষেত্রমোহন বিতণ্ডার মাঝখানেই রণে ভংগ দিয়া সরিয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহার সে ভাব নয় ইহা ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া বিভা আপনাকে সম্বরণ করিল।

বস্তুতঃই তাহার বিরুদ্ধে আজ ক্ষেত্রমোহনের মনের মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল না। পরের দোষ ধরিয়া একটু বলা বিভার একপ্রকার স্বভাবের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই হয়ত ইহাতে অশিষ্টতা ভিন্ন আর কোন ক্ষতিই হইত না, কিন্তু এই যে নিরপরাধ বধূটির বিরুদ্ধে প্রথম দিন হইতেই সে একেবারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে, বিনা দোষে অশেষ দুঃখ-ভোগের পর যে স্ত্রী স্বামীর গৃহকোণে দৈবাৎ স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার সেইটুকু স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি, আর একজন স্বামীর চিত্ত দুঃখ ও বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া আনিতেছিল। অথচ ইহারই পদধূলির যোগ্যতাও অপরের নাই এই সত্য চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের তিক্ত-ব্যথিত চিত্তে বিভার বিরুদ্ধে আর কোন ক্ষমা রহিল না। অথচ এই কথা প্রকাশ করিয়া বলাও এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে তেমনি সুকঠিন। বরঞ্চ যেমন করিয়া হোক সভ্যতার আবরণে বাহিরে ইহাকে গোপন করিতেই হইবে।

ক্ষেত্রমোহন ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, উমা, তোমার এই পল্লীগ্রামের বৌদিদির কাছে এসে যদি রোজ দুপুর-বেলা বসতে পারো, যে-কোন সংসারেই পড় না কেন দিদি, দুঃখ পাবে না তা বলে রাখচি।

উমা হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। উষা মুখ না তুলিয়া বলিল, তা হলেই হয়েছে আর কি। আপনাদের সমাজে ওকে এক-ঘরে করে দেবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা দিক বৌঠাকরুণ। কিন্তু ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যে পরম সুখে থাকবে তা বাজি রেখে বলতে পারি।

শৈলেশ বিভার প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, বাজি রাখতে আর হবে না ভাই বলাতেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিয়া বলিলেন, আর যাই হোক আজকের কাজটুকুও যদি মনে রাখতে পারে ত নিরর্থক নিত্য নূতন মোজা কেনার দায় থেকেও অন্ততঃ ওর স্বামী বেচারা অব্যাহতি পারে !

বিভা সেই অবধি চুপ করিয়াই ছিল, কিন্তু আর পারিল না। কিন্তু গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন গোপন করিয়া একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, ওর ভবিষ্যৎ সংসারে হয়ত মোজায় তালি দেবার প্রয়োজন না'ও হ'তে পারে। দিলেও হয়ত ওর স্বামী পরতে চাইবেন না। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যায় বই কি। চোখ-কান খোলা থাক্‌লেই বলা যায়। যে সত্যিকার জাহাজ চালায়, সে জলের চেহারা দেখলেই টের পায় তলা কত দূরে। বৌঠাকরুণ, জাহাজে পা দিয়েই যে ধরে ফেলেছিলেন একটু অসাবধানেই তলার পাঁক ঘুলিয়ে উঠ্‌বে, এতেই আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিই। আর শৈলেশের পক্ষ থেকে ত লক্ষকোটী ধন্যবাদেও পর্য্যাপ্ত হবার নয়।

ঊষা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে বলিল, নিজের গৃহে নিজের স্বামীর অবস্থা বোঝবার চেষ্টা করার মধ্যে ধন্যবাদের ত কিছুই নেই ক্ষেত্রমোহনবাবু।

এ কথার জবাব দিল বিভা। সে কহিল, অন্ততঃ নিজের স্ত্রীকে অপমান করার কাজটা হয়ত সিদ্ধ হয়। তা ছাড়া কাউকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলেই বোধ হয় কারুর ভক্তি-শ্রদ্ধা উথ্‌লে উঠে।

ঊষা মুখ তুলিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, স্বামীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টাকে কি উঞ্ছবৃত্তি বলে ঠাকুরঝি ?

ক্ষেত্রমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, না বলে না। পৃথিবীর কোন ভদ্রব্যক্তিই এমন কথা মুখে আনতেও পারে না। কিন্তু স্বামীর চক্ষে স্ত্রীকে নিরন্তর হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে হৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি বলে, আপনার ঠাকুরঝিকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে নিন।

বিভার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। অভিভূতের মত একবার সে বক্তার মুখের দিকে, একবার শৈলেশের মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এতগুলি লোকের সমক্ষে তাহার স্বামী যে যথার্থ-ই তাহাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারে প্রথমে সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিল না। তার পরে শৈলেশের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এর পরে আর ত তোমার বাড়িতে আসতে পারিনে দাদা। আমি তা হ'লে চিরকালের মতই চললুম।

শৈলেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, উষা হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমরা ত তোমাকে কোন কথা বলি নি ভাই!

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল, এবং এই গণ্ডগোলের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বিভা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যখন আপনার কেবল শত্রুতাই কর্‌চি, তখন এ বাড়িতে আমার আর কিছুতেই প্রবেশ করা উচিত নয়।

উষা কহিল, কিন্তু এমন কথা আমি ত কোন দিন মনেও ভাবি নি ঠাকুরঝি।

বিভা কানও দিল না। অশ্রু-বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল, আজ উনি মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেলেন, কাল হয়ত দাদাও বলবেন—তাঁর নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে কথা কইতে যাওয়া শুধু অপমান হওয়া। উমা, বাড়ি যাও ত এস। এই বলিয়া সে নিচে নামিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বৌদিদি যখন নেই, তখন এ বাড়িতে পা দিতে যাওয়াটাই আমাদের ভুল। এবার বাড়ির সকল সম্বন্ধই আমার ঘুচলো। এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নিচে চলিয়া গেল। শৈলেশ পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সসংকোচে কহিল, না হয়, আমার লাইব্রেরী ঘরে এসেই একটু বস্ না বিভা।

বিভা ঘাড নাড়িয়া কহিল, না। কিন্তু আমার বৌদিদিকে একেবারে ভুলে যেও না দাদা। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল সোমেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়—দোহাই তোমার, তাকে নষ্ট হ'তে দিয়ো না। আজ তাকে যে ভাবে চোখে দেখতে পেলুম, এই শিক্ষাই যদি তার চলতে থাকে, সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারব না।

তাহার পর অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া শৈলেশ মিনতি করিয়া কহিল, তুই আমার বাইরের ঘরে বসবি চল্ বোন্, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি না জানি না, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বসতে চাই নে দাদা, কিন্তু সোমেন আমাদের বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার প্রতি একটু দৃষ্টি

রেখো। একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যেয়ো না দাদা! এই বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার গাড়িতে গিয়া উপবেশন করিল। উমা বরাবর নীরব হইয়াই ছিল, এখনও সে একটি কথাতেও কথা যোগ করিল না, নিঃশব্দে বিভার পার্শ্বে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিভা, সোমেনকে না হয় তুই নিয়ে যা। তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই, তাকে তুই নিজের মত করেই মানুষ ক'রে তোল্।

বিভা এবং উমা উভয়েই একান্ত বিস্ময়ে শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভা কহিল, কেন এই নিরর্থক প্রস্তাব করচ দাদা, এ তুমি পারবে না—তোমাকে পারতেও দেব না।

শৈলেশ ঝোঁকের উপর জোর করিয়া উত্তর দিল, আমি পারবই—এই তোকে কথা দিলাম বিভা।

বিভা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মাথা নাড়িয়া কহিল, পারো ভালই। তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। তাকে উচ্চ শিক্ষা দেবার টাকা যদি তোমার না থাকে, আমিও কথা দিচ্চি দাদা, সে ভার আজ থেকে আমি নিলাম। এই বলিয়া সে উমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল উপরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঊষা নিচে তাদের দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরক্ষণে মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শৈলেশ তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। উপরে যাইতে তাহার ইচ্ছাও হইল না, সাহসও ছিল না। সমস্ত কথাই যে ঊষা শুনিতে পাইয়াছে, ইহা জানিতে তাহার অবশিষ্ট ছিল না।

৯

রাত্রে খাবার দিয়া স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঊষা অন্যান্য দিনের মত নিকটে বসিয়া ছিল। শুধু সোমেন আজ তাহার কাছে ছিল না। হয়ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিম্বা এমনিই কিছু একটা হইবে। শৈলেশ আসিল; তাহার মুখ অতিশয় গম্ভীর—হইবারই কথা। ব্যর্থ প্রশ্ন করা ঊষার স্বভাব নয়; আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এবং যাহা জানে না তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। স্ত্রীর এই স্বভাবের পরিচয়টুকু অন্ততঃ শৈলেশ এই কয়দিনেই পাইয়াছিল। আহারে বসিয়া মনে মনে সে রাগ করিল, কিন্তু আশ্চর্য্য হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে চাহিয়া সে স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার নিশ্চয় বোধ হইল ঊষা ইচ্ছা করিয়াই আলোটার দিকে আড় হইয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত আজ সে খাইতে পারিল না। যে জন্য আজ তাহার আহারে রুচি ছিল না তাহার কারণ আলাদা, তথাপি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও গায়ে পড়িয়া শুনাইয়া দিল যে অনভ্যস্ত খাওয়া-পরা শুধু দু-চার দিনই চলিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড করাইলে আর স্বাদ থাকে না। তখন অরুচি অত্যাচারে গিয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা তর্কের দিক দিয়া যাই হোক্, এ ক্ষেত্রে সত্য নয় জানিয়া ঊষা চুপ করিয়া রহিল। মিথ্যা জিনিসটা যে নিশ্চয়ই মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিতে কোনদিনই তাহার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু এমন করিয়া নিঃশব্দে অস্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের রাগ বাড়িয়া যায়। তাই, শুইতে আসিয়া শৈলেশ খামোকা বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার প্রতি একদিন অতিশয় অন্যায় করেছিলাম তা মানি, কিন্তু তাই বলেই আজ তোমার ছাড়া আর কারও কোন ব্যবস্থাই চলবে না এও ত ভারি জুলুম।

এরূপ শক্ত কথা শৈলেশ প্রথম দিনটাতেও উচ্চারণ করে নাই। ঊষা মনে মনে বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে শুধু বলিল, আমি বুঝতে পারি নি।

কিন্তু এমন করিয়া অত্যন্ত বিনয়ে কবুল করিয়া লইলে আরও রাগ বাড়ে। শৈলেশ কহিল, তোমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সমাজ সমস্ত উল্টে দিয়ে যদি এ বাড়িকে তোমার বাপের বাড়ি বানিয়ে তুলতে চাও ত আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুস্কিল হ'তে থাকে। সোমেনকে বোধ হয় কাল ওর পিসির বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি কি বল?

ঊষা কহিল, ওর ভালর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত দিতে হবে বই কি।

তাহার বলার মধ্যে উত্তাপ বা শ্লেষ কিছুই ধরিতে না পারিয়া শৈলেশ দ্বিধার মধ্যে পড়িল। কিসের জন্য যে এসব

করিতেছে তাহার হেতুও মনের মধ্যে বেশ দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু এই সকল দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসংগত অভিমানের দ্বার ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, হাঁ, প্রয়োজন আছে বলেই সকলের বিশ্বাস। যে সব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি আমরা মানি নে, মানতে পারি নে, তাই নিয়ে অযথা ভাই-বোনের মধ্যে বিবাদ হয়, সমাজের কাছে পরিহাসের পাত্র হ'তে হয়—এ আমার ভাল লাগে না।

উষা প্রতিবাদ করিল না, নিজের দিক হইতে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা মাত্র করিল না, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শৈলেশের তাহা কানে গেল। উষা নিজে কলহ করে নাই, তাহার পক্ষ লইয়া বিভার প্রতি যত কটু কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার একটিও যে উষার নিজের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তাহা এতখানিই সত্য যে সে লইয়া ইঙ্গিত করাও চলে না, ভুলাও যায় না। সুতরাং ক্ষেত্রমোহনের দুষ্কৃতির শাস্তি যে আর একজনের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে না—ইহাতে প্রতিহিংসার কিছুই যে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে সে পুনশ্চ কহিল, যাকে বিলেতে গিয়ে লেখা-পড়া শিখতে হবে, যে সমাজের মধ্যে তাকে চলা-ফেরা করতে হবে, ছেলে-বেলা থেকে তার সেই আব-হাওয়ার মধ্যে মানুষই হওয়া আবশ্যক। শিশুকালটা তার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাটতে

দেওয়া তার প্রতি গভীর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিল, এ সম্বন্ধে তোমার বলবার কিছু না থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মুখ বুজে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেই তার জবাব হয় না। সোমেনের সম্বন্ধে আমরা রীতিমত চিন্তা করেই তবে করেচি।

সোমেন পাশেই ঘুমাইতেছিল। এ বাটীতে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায়, আসিয়া পর্য্যন্ত ঊষা তাহাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিত। তাহার নিদ্রিত ললাটের উপর সে সস্নেহে ও সন্তর্পণে বাম হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, যাই কেন না স্থির কর, ছেলের কল্যাণের জন্যই তুমি স্থির করবে। এ ছাড়া আর কিছু কি কেউ কখনও ভাবতে পারে? বেশ ত তাই তুমি করো।

ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া ঘরের কোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সেই সামান্য আলোকে শৈলেশ নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অদূরবর্ত্তী শয্যায় শায়িত ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা ছাড়া সে সোমেনের সমস্ত পড়ার খরচ দেবে বলেছে। সে ত কম নয়!

ঊষার কণ্ঠস্বরে কিছুতেই উত্তেজনা প্রকাশ পাইত না। শান্ত ভাবে কথা কহাই তাহার প্রকৃতি। কহিল, না সে হ'তে পারবে না। ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।

শৈলেশ কহিল, সে যে অনেক টাকার দরকার।

উষা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, দরকার হয় দিতে হবে। কিন্তু আর রাত জেগো না, তুমি ঘুমোও।

পরদিন অপরাহ্ণ-কালে শৈলেশ কলেজ ও ক্লাব হইতে বাড়ি ফিরিয়া রান্নার এক প্রকার সুপরিচিত ও সুপ্রিয় গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিত চিত্তে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল পরে চা ও খাবার লইয়া যে ব্যক্তি দর্শন দিলেন, শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সে মুসলমান।

রাত্রে খাবার-ঘরে আলো জ্বলিল, এবং সজ্জিত টেবিলের চেহারা দেখিয়া শৈলেশ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিল না যে ইহারই জন্য অত্যন্ত সংগোপনে মন তাহার সত্যই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিনার তখনও দুই-একটা ডিসের অধিক অগ্রসর হয় নাই, উষা আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া একটু দূরে বসিল।

শৈলেশের মন প্রসন্ন ছিল, ঠাট্টা করিয়া বলিল, ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণেও যে অর্দ্ধ ভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

উষা অল্প একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ তোমার উচিত নয়। যে শাস্ত্রকে তুমি মানো না গণ না, তার দোহাই দেওয়া তোমার সাজে না।

শৈলেশও হাসিল। কহিল, আচ্ছা হার মানলুম। কিন্তু

শাস্ত্রের দোহাই আমিও দেব না, তুমিও কিন্তু পালিয়ো না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে ভাগ্যে কাল খোঁটা দিয়েছিলুম, তাই ত আজ এমন বস্তুটি অদৃষ্টে জুটলো? ঠিক না উষা? কিন্তু খরচপত্র কি তোমার খুব বেশি পড়বে?

উষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। অপব্যয় না হ'লে কোন খাবার জিনিসেই খুব বেশি পড়ে না। আসচে মাস থেকে আমি নিজেই এ সব করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এইটি দেখো জিনিস-পত্র বৃথা নষ্ট যেন না হয়! আমার খরচের খাতায় যেমনটি লিখে রেখেচি, ঠিক তেম্‌নটি যেন হয়। হবে ত?

শৈলেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন হবে না শুনি?

উষা তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরবে নিচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কাল সারা-রাত ভেবে ভেবে আমি যা স্থির করেচি, তাকে অস্থির করবার জন্যে আমাকে আদেশ করো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

শৈলেশ আর্দ্রচিত্তে কহিল, তা ত আমি কোনদিন করবার চেষ্টা করি নে উষা। আমি নিশ্চয় জানি তোমার সিদ্ধান্ত তোমারই যোগ্য। তার নড়-চড় হয়ও না, হওয়া উচিতও নয়। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তোমার মন তেম্‌নি সবল তেম্‌নি দৃঢ়।

স্বামীর মুখের উপর হইতে উষা দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সত্যিই আর কিছু হবার নয়, আমি অনেক ভেবে দেখেচি।

শৈলেশ নিশ্চয় বুঝিল ইহা সোমেনের কথা। সহাস্যে কহিল, ভূমিকা ত হ'ল, এখন স্থির কি করেছ বল ত? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি তোমাকে কখনো অন্যথা করতে অনুরোধ করব না।

ঊষা মিনিট-খানেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে বলিল, দাদার সংসারে আমার ত চলে যাচ্ছিল—বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কাল আবার আমি তাঁদের কাছেই যাবো।

তাঁদের কাছে যাবে? কবে ফিরবে?

ঊষা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, ফিরতে আর আমি পারব না। আমি অনেক চিন্তা ক'রে দেখেচি এখানে আমার থাকা চল্‌বে না। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

কথা শুনিয়া শৈলেশ একেবারে যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন নিরন্তর মুগুর মারিয়া মারিয়া কহিতে লাগিল যে লৌহ-কবাট রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া শৈলেশের প্রথমেই মনে হইল সারা-রাত্রি ধরিয়া সে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল ঊষা নিত্য-নিয়মিত গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা—সোমেন সঙ্গে, বোধ হয় সে খাবার তাগাদায় আছে—সিঁড়িতে নামিবার পথে দেখা হইতে ঊষা মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার চা তৈরি ক'রে ফেলেছে, মুখ হাত ধুতে দেরি করলে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে কিন্তু! একটু তাড়াতাড়ি নিয়ো।

শৈলেশ কহিল, বেশ ত, তুমি পাঠিয়ে দাও গে, আমার এক মিনিট দেরি হবে না। এই বলিয়া সে যেন লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তাহার বাথ-রুমে প্রবেশ করিল। মনে মনে কহিল, আচ্ছা, ইডিয়ট্ আমি। দাম্পত্য-কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, সকাল-বেলায় এই কথা মনে করিয়া শুদ্ধ তাহার হাসি পাইল তাই নয়, নিজের কাছে লজ্জা বোধ হইল। সংসার করিতে একটা মতভেদ বা দুটো কথা-কাটাকাটি হইলেই স্ত্রী যদি স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া দাদার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, দুনিয়ায় ত তাহা হইলে মানুষ বলিয়া আর কোন জীবই থাকিত না। সোমেনের যা হইলেও বা দু-দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু ঊষার মন নিছক

হিন্দু-আদর্শে-গড়া স্ত্রী —ধর্ম্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তাহা হইলে সংসারে আর বাকি থাকে কি? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগলামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল, এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়া সে ঊষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজের আরও দুই-চারিজন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক্ বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। এমনি ধারা শিক্ষা-দীক্ষা পেলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নব-নিযুক্ত মুসলমান খানসামা চা, রুটি, মাখন, কেক্ প্রভৃতি প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া হাজির হইতে তাহার হঠাৎ যেন চমক্ লাগিল। এই সকল বস্তুতেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, মাঝে কেবল দিন-কয়েক বাধা পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু টেবিলে রাখিয়া দিয়া বেহারা চলিয়া গেলে এই জিনিসগুলির পানে চাহিয়াই আজ তাহার অরুচি বোধ হইল; ঊষা গৃহে আসিয়া পর্য্যন্ত এই সকলের পরিবর্ত্তে নিম্‌কি, কচুরি প্রভৃতি তাহার স্বহস্ত-রচিত খাদ্য-দ্রব্য সকালে চায়ের সঙ্গে আসিত, সে নিজে উপস্থিত

থাকিত, কিন্তু আজ তাহার কোনটাই নাই দেখিয়া তাহার আহারে প্রবৃত্তি রহিল না। শুধু এক পেয়ালা চা কেৎলি হইতে নিজে ঢালিয়া লইয়া খানসামাকে ডাকিয়া সমস্ত বিদায় করিয়া দিয়া শৈলেশ পর্দ্দার বাহিরে একটা অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনির আশায় কান খাড়া করিয়া রাখিল, এবং না-খাওয়ার কৈফিয়ৎ যে একটু কড়া করিয়াই দিবে এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে অযথা দেরি করিয়া পেয়ালা যখন শেষ করিল তখন চা ঠাণ্ডা এবং বিস্বাদ হইয়া গেছে; ফিরিয়া আসিয়া লোকটা শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না, ঊষা এ ঘরে প্রবেশ করিল না।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল, স্নানাহার সারিয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। খাবার সময় আজও ঊষা অন্যান্য দিনের মত কাছে আসিয়া বসিল; তাহার আগ্রহ, যত্ন বা কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন প্রভেদ বাড়ির কাহারও কাছে ধরা পড়িল না, পড়িল শুধু শৈলেশের কাছে। একটা রাত্রির মধ্যে একটা লোক যে বিনা চেষ্টায়, বিনা আড়ম্বরে কতদূরে সরিয়া যাইতে পারে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলেজ যাইবার পোষাক পরিতে এ ঘরে ঢুকিয়া এখন প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল টেবিলের উপরে সংসার-খরচের সেই ছোট্ট খাতাটি। হয় ত কাল হইতেই এম্‌নি পড়িয়া আছে, সে লক্ষ্য করে নাই—না হইলে তাহারই জন্য ঊষা এইমাত্র রাখিয়া গেছে তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়। আজও ত মাস শেষ হয় নাই—অকস্মাৎ এখানে

ইহার প্রয়োজন হইলই বা কিসে? তথাপি গলায় টাই বাঁধা তাহার অসমাপ্ত হইয়া রহিল, কতক কৌতূহলে, কতক অন্য-মনস্কতাবশে একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইয়া একেবারে শেষ পাতায় আসিয়া থামিল। পাতায় পাতায় একই কথা—সেই মাছ, শাক, আলু, পটল, চালের বস্তা, দুধের দাম, চাকরের মাইনে—কাল পর্য্যন্ত জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া মজুত টাকার অঙ্ক স্পষ্ট করিয়া লেখা। এই লেখা যেদিন আরম্ভ হয়, সেদিন সে এলাহাবাদে। তখনও তাহার হাত ছিল না, আর আজ এইখানেই যদি ইহার সমাপ্তি ঘটে তাহাতেও তেমনি হাত নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম দিনের প্রথম পাতাটির প্রতি শৈলেশ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। এই জিনিসটা সংসারে তাহার দুদিনের ব্যাপার। আগেও ছিল না, পরেও যদি না থাকে ত সংসার অচল হইয়া থাকিবে না—দুদিন পরে হয়ত সে নিজেই ভুলিবে। তবুও কত কি-ই না আজ মনে হয়। খাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনশ্চ টাই বাঁধার কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া হঠাৎ এই কথাটাই আজ তাহার সবচেয়ে বড় করিয়া মনে হইতে লাগিল, এ জগতে কোন-কিছুর মূল্যই একান্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। এই খাতা, এই হিসাব লেখারই একদিন প্রয়োজনের অবধি ছিল না, আবার একদিন সেই সকলই না কতখানি অকিঞ্চিৎকর হইতে চলিল।

অবশেষে পোষাক পরিয়া শৈলেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে উষাকে ডাকিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা

করিতে পারিল না। অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে মন তাহার বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল, তথাপি অনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিয়া লইবার সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

১১

কলেজের ছুটির পরে শৈলেশ বাটী না ফিরিয়া সোজা বিভার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল অনুমান তাহার নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। ভগিনীপতি আদালতে বাহির হন নাই, এবং ইতিমধ্যেই উভয়ের মধ্যে এক প্রকার রফা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সে তৃপ্তি বোধ করিল। কহিল, কই সোমেনকে আন্‌তে ত লোক পাঠালে না বিভা ?

বিভা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, হাতি যে কিন্‌ছিল সে নেই।

তার মানে ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি গল্প শোন নি ? কে একজন মাতাল নাকি নেশার ঝোঁকে রাজার হাতি কিন্‌তে চেয়েছিল! পরদিন ধরে এনে এই বেয়াদপির কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সে হাত জোড় করে বলেছিল, হাতিতে তার প্রয়োজন নেই, কারণ হাতির যে সত্যিকারের খরিদ্দার সে আর নেই, চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি

নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিলেন, এবং পরে হাসি থামিলে বলিলেন, এই গল্পটা শুনিয়ে বৌঠাকরুণকে রাগ করতে বারণ করো শৈলেশ, সত্যিকার খদ্দের আর নেই—সে চলে গেছে। মায়ের চেয়ে পিসির কাছে এসে যদি ছেলে মানুষ হয়, তার চেয়ে না হয় ধার-ধোর করে বিভাকে একটা হাতিই আমি কিনে দেব। এই বলিয়া তিনি বিভার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে হাসিতে শৈলেশ যোগ দিল না, এবং পাছে পরিহাসের সূত্র ধরিয়া বিভার সুপ্ত ক্রোধ উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষেত্রমোহন লজ্জিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি শৈলেশ ?

শৈলেশ কহিল, বিভার কথায় সোমেনের সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন হবে না তখন আবার কোন একটা নূতন ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, অর্থাৎ ভাইনির হাতে ছেলে বিশ্বাস করা যায় না—না ?

শৈলেশ বলিল, এই কটূক্তির জবাব না দিয়েও এ কথা বলা যেতে পারে যে ঊষা শীঘ্রই চলে যাচ্চেন।

চলে যাচ্চেন ? কোথায় ?

শৈলেশ কহিল, যেখান থেকে এসেছিলেন—তাঁর দাদার বাড়ীতে।

ক্ষেত্রমোহনের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি স্ত্রীর মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, আমি এই রকমই কতকটা ভয় করেছিলাম শৈলেশ।

বিভা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, স্বামীর সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের অর্থ সে বুঝিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমাকে নিমিত্ত করেই কি তুমি এই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছো? তা যদি হয়, আমি নিষেধ করব না, কিন্তু একদিন তোমাদের দুজনকেই কাঁদতে হবে বলে দিচ্চি।

শৈলেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পরে সে মুসলমান ভৃত্য রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সকালের সেই খাতাটার কথা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিল, যেতে আমি বলি নি, কিন্তু যেতে বাধাও আমি দেব না। আত্মীয়-বন্ধু মহলে একটা আলোচনা উঠ্‌বে, এবং তাতে যশ আমার বাড়বে না তাও নিশ্চয় জানি, কিন্তু প্রকাণ্ড ভুলের একটা সংশোধন হ'য়ে গেল, তার জন্যে ভগবানকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দেব।

বিভা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ক্ষেত্রমোহনও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিলেন না। শৈলেশ কহিল, তোমাদের কাছে সমস্ত জানানো কর্ত্তব্য বলেই আজ আমি এসেছি। অন্ততঃ তোমরা না আমাকে ভুল কর।

ক্ষেত্রমোহন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, তার সাধ্য কি। হাঁ হে শৈলেশ, ভবানীপুরে সেই সে একবার একটা কথাবার্ত্তা হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাঁরা আর কেউ খবর-টবর নিয়েছিলেন কি?

শৈলেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, তোমার ইঙ্গিত এত অভদ্র এবং হীন যে আপনাকে সামলানো শক্ত। তোমাকে কেবল এই বলেই ক্ষমা করা যায় যে, কোথায় আঘাত করচ তুমি জানো না। এই

বলিয়া সে ভিতরের উত্তাপে একবার নড়িয়া-চড়িয়া আবার সোজা হইয়া বসিল।

ক্ষেত্রমোহন তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অবিচলিত ভাবে এবং অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়া কহিলেন, সে ঠিক। যায়গাটা যে তোমার কোথায় আমি ঠাওর করতে পারি নি।

শৈলেশ নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বলিল, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সেদিন যে ব্যবহার করলে, তাতে আমি আর তোমার কাছে কি বেশি প্রত্যাশা করতে পারি! তোমার দম্ভে ঘা লাগ্‌বে ব'লেই কখনো কিছু বলি নি, কিন্তু বহুপূর্ব্বেই বোধ করি বলা উচিত ছিল।

ক্ষেত্রমোহন মুচকিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাই ত হে শৈলেশ, it reminds ; স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার! ওটা আজও ঠিক শিখে উঠ্‌তে পারি নি—শেখবার বয়সও উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে—কিন্তু তুমি যদি এ সম্বন্ধে একটা বই লিখে যেতে পারতে ভাই—আচ্ছা, তোমরা ভাই-বোনে ততক্ষণ নিরিবিলি একটু পরামর্শ কর, আমি এলাম ব'লে। এই বলিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শৈলেশ চেঁচাইয়া বলিল, বই লিখতে হয়ত দেরি হ'তেও পারে, কিন্তু ততক্ষণ শুনে যাও, ওই যে তুমি ভবানীপুরের উল্লেখ ক'রে বিদ্রূপ করলে তাঁরা কেউ আমার খবর নিন্ বা না নিন্ আমাকে উদ্যোগী হ'য়ে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের বাহির হইতে শুধু জবাব দিল, নিশ্চয় হবে। এম্‌নিই ত অযথা বিলম্ব হ'য়ে গেছে।

পরদিন সকালেই আসিয়া ক্ষেত্রমোহন পটলডাঙগার বাড়িতে দেখা দিলেন। শৈলেশ স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ অসময়ে ভগিনীপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কালকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের পরে অযাচিত ও এত শীঘ্র ইহাকে সে আশা করে নাই। মনে মনে কতকটা লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, আজ কি হাইকোর্ট বন্ধ না কি?

ক্ষেত্রমোহন সহাস্যে বলিলেন, প্রশ্ন বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, তবে প্র্যাক্‌টিশ ছেড়ে দিলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ততোধিক বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, বোধ করি আমিও বাহুল্য! আমার স্নানের সময় হয়েছে তাতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবে না?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, না। তুমি যেতে পারো।

বৌঠাক্‌রুণ, আস্‌তে পারি?

পূজার ঘর এ গৃহে ছিল না। শোবার ঘরের একধারে আসন পাতিয়া ঊষা আহ্নিকে বসিবার আয়োজন করিতেছিল; কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিয়া ভিজা চুলের উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া আহ্বান করিল, আসুন।

ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, অসময়ে এসে অত্যাচার করলুম। হঠাৎ বাপের বাড়ি যাবার খেয়াল হয়েছে নাকি? বাবা কি পীড়িত?

ঊষা কহিল, বাবা বেঁচে নেই।

ওঃ—তা হলে মার অসুখ না কি?

উষা বলিল, তিনি বাবার পূর্ব্বেই গেছেন।

ক্ষেত্রমোহন ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তা হ'লে যাচ্ছেন কোথায়? আছে কে? এমন যায়গায় ত কোন মতেই যাওয়া হ'তে পারে না। শৈলেশের কথা ছেড়ে দিন, আমরাই ত রাজি হ'তে পারি নে।

উষা মুখ নিচু করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পারবেন না?

না, কিছুতেই না।

কিন্তু এতকাল ত আমার সেই দাদার বাড়িতেই কেটে গেছে ক্ষেত্রবাবু! অচল হয়ে ত ছিল না।

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন, যদি নিতান্তই যান্, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে তা সত্যি ক'রে বলে যান। না হ'লে কিছুতেই যেতে পাবেন না।

উষা নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, কিন্তু সোমেন?

উষা কহিল, তার পিসি আছেন।

ক্ষেত্রমোহন হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সে আমার স্ত্রী। আমি তার হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

উষা মৌন হইয়া রহিল।

পারবেন না ক্ষমা করতে?

উষা তেম্‌নি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, জগতে অপরাধ যখন আছে, তখন তার দুঃখ-ভোগও আছে, এবং থাকবারই কথা। কিন্তু এর বিচার নেই কেন বল্‌তে পারেন?

ঊষা কহিল, অর্থাৎ একজনের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে পোহাতে হয় কেন? এইমাত্রই জানি, কিন্তু কেন, তা আমি জানি নে ক্ষেত্রমোহনবাবু।

কবে যাবেন?

দাদা নিতে এলেই। কালও আস্‌তে পারেন।

ক্ষেত্রমোহনবাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, একটা কথা আপনাকে কোনদিন জানাবো না ভেবেছিলুম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, গোপন রাখলে আমার অপরাধ হবে। আপনার আসবার পূর্ব্বে এ বাড়িতে আর একজনের আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মনে হয় সে ষড়যন্ত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

ঊষা কহিল, আমি জানি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা হ'লে রাগ ক'রে সেই ষড়যন্ত্রটাই কী অবশেষে জয়ী হ'তে দেবেন? এতেই কি—

কথা শেষ হইতে পাইল না। ঊষা শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, জয়ী হোক্‌ পরাস্ত হোক্‌ ক্ষেত্রমোহনবাবু আমাকে আপনি ক্ষমা করুন— এই বলিয়া ঊষা দুই হাত যুক্ত করিয়া এতক্ষণ পরে ক্ষেত্রমোহনের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল।

সেই দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেত্রমোহন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ শৈলেশ বন্ধ করিল, কিন্তু উষা করিল না। তাহার আচরণে লেশমাত্র পরিবর্ত্তন নাই—সাংসারিক যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম ঠিক্ তেম্‌নিই সে করিয়া যাইতেছে। মুখ ফুটিয়া শৈলেশ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, অথচ সবচেয়ে মুস্কিল হইল তাহার এই কথা ভাবিয়া, এ গৃহ যে লোক চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেই গৃহের প্রতি তাহার এতখানি মমতা-বোধ রহিল কি করিয়া? আজ সকালেই তাহার কানে গিয়াছে; দেয়ালের গায়ে হাত মুছিবার অপরাধে উষা নতুন ভৃত্যটাকে তিরস্কার করিতেছে। অভ্যাসমত কাজের ভুল-ভ্রান্তি তাহার না-ই যদি বা হয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে এতটুকু শিথিলতাও যে শৈলেশের চোখে পড়ে না! উষাকে ভাল করিয়া জানিবার তাহার সময় নাই, তাহাকে সে সামান্যই জানিয়াছে, কিন্তু সেইটুকু জানার মধ্যেই কিন্তু এটুকু জানা তাহার হইয়া গেছে যে যাবার সংকল্প তাহার বিচলিত হইবে না। অথচ সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এ বয়সে তাহার সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিশ্রাম নাগর-দোলায় পাক খাওয়াইয়া মারিতেছে!

ক্ষেত্রমোহন আসিয়া একেবারে সোজা রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দেখা দিলেন, কহিলেন, প্রসাদ পাবার আর বিলম্ব কত বৌঠাকরুণ ?

ঊষা মাথার কাপড়টা আরও একটুখানি টানিয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, সে কথা আপনার বড়-কুটুম্বটিকে জিজ্ঞেসা ক'রে আসুন, নইলে আমার সব হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ঠক্‌বার পাত্রীই আপনি নয়, কিন্তু ঠকে গেলাম আমি নিজে। রান্নার বহর দেখে এই ভরা-পেটেও লোভ হয় বৌঠাক্‌রুণ, কিন্তু অসুখের ভয় করে। তবে নেমন্তন্ন ক্যান্‌সেল কর্‌লে চল্‌বে না, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনার ছেলেটি কই ?

ঊষা কহিল, আজ কি যে তার মাথায় খেয়াল এলো কিছুতেই ইস্কুলে যাবে না। কোনমতে দুটি খাইয়ে এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনাকে সে বড্ড ভালবাসে। একটু-খানি হাসিয়া কহিলেন, ভাল কথা, আপনার সেই বাপের বাড়ি যাবার প্রস্তাবটার কি হ'ল ? বাস্তবিক বৌঠাক্‌রুণ, রাগের মাথায় আপনার মুখ দিয়েও যদি বে-ফাঁস কথা বার হয় ত ভরসা করবার সংসারে আর কিছু থাকে না।

ঊষা এ অভিযোগের উত্তর দিল না, নতমুখে নীরব হইয়া রহিল, তথা হইতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের পড়ার

ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলেশ স্নানান্তে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিলেন মুখ ফিরিয়া চাহিলেন।

ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজ আজ বন্ধ না কি হে?

না। তবে প্রথম দুঘণ্টা ক্লাস নেই।

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা বেশ। কিন্তু বৌঠাকরুণের বাপের বাড়ি যাবার আয়োজন কিরূপ করলে?

শৈলেশ কহিলেন, আয়োজন যা করবার তিনি গেলে তবে করব। শুনচি কাল তাঁর দাদা এসে নিয়ে যাবেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি একটি ইডিয়ট্। ও স্ত্রী নিয়ে তুমি পেরে উঠবে না ভাই, তার চেয়ে বরঞ্চ বদলাবদলি করে নাও, তুমিও সুখে থাকো, আমিও সুখে থাকি।

শৈলেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বয়স ত ঢের হ'ল ক্ষেত্র, এইবার এই অভদ্র রসিকতাগুলো ত্যাগ কর না।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ত্যাগ কি সাধে করতে পারি নে ভাই, তোমাদের ব্যবহারে পারি নে। তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে বললেন, বাপের বাড়ি চলে যাবো, তুমি অমনি জবাব দিলে, যাবে যাও—আমার ভবানীপুর এখনো হাতছাড়া হয় নি। এই সমস্ত কি ব্যবহার? ভাই-বোন একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। যাক্, আমি সব ভেস্তে দিয়ে এসেছি, যাওয়া-টাওয়া তাঁর হবে না। তুমি কিন্তু আর খুঁচিয়ে ঘা করো না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন, উঃ—ভারি বেলা হ'য়ে গেল, এখন চললুম, কাল সকালেই আসবো। ফিরিতে উদ্যত হইয়া সহসা গলা খাটো

করিয়া কহিলেন, দিন-কতক একটু বনিয়ে চল না শৈলেশ! অধ্যাপকের ঘরের মেয়ে, অনাচার সহ্য করতে পারেন না, খানা-টানাগুলো দুদিন না-ই খেলে! তা ছাড়া, এসব ভালও ত নয়— খরচের দিকটাতেই চেয়ে দেখ না? আচ্ছা, চললুম ভাই, এই বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্র-মোহন কখন্ আসিল, কি বলিয়া, কি করিয়া হঠাৎ সমস্ত ব্যাপার উল্টাইয়া দিয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে। উত্তরের ঢাকা বারান্দায় যথানিয়মে আসন পাতিয়া ঠাঁই করা। প্রতিদিনের মত বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া অদূরে ঊষা বসিয়া আছে, শৈলেশ ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে বসিয়া গেল। অনেকবার তাহার ইচ্ছা হইল ক্ষেত্রর কথাটা মুখো-মুখি যাচাই করিয়া লইয়া সময়োচিত মিষ্ট দুটো কথা বলিয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিতে পারিল না, কিছুতেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। এমন কি সোমেনের ছুতা করিয়াও আলোচনা আরম্ভ করিতে পারিল না। অবশেষে খাওয়া সমাধা হইলে নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলেশ সেইমাত্র হাত-মুখ ধুইয়া পড়িবার ঘরে চা খাইতে যাইতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? আগন্তুক উষার ছোট ভাই। সে আপনার পরিচয় দিয়া কহিল, দাদা নিজে আসতে পারলেন না, দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বেশ ত নিয়ে যান। এই বলিয়া শৈলেশ তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রাতরাশের সর্ব্ববিধ-সরঞ্জাম টেবিলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু কেবল মাত্র এক বাটি চা ঢালিয়া লইয়া সে নিজের আরাম-কেদারায় আসিয়া উপবেশন করিল, অবশিষ্ট সমস্তই পড়িয়া রহিল, তাহার স্পর্শ করিবারও রুচি হইল না। উষার পিতৃগৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। এ দিক দিয়া অবিনাশকে দেখিয়া তাহার চমকাইবার কিছু ছিল না, এবং আসিয়াছে বলিয়াই যে অপরকে যাইতেই হইবে এমনও কিছু নয়—হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই হইবে না—কিন্তু নিশ্চয় একটা কিছু এ বিষয়ে না জানা পর্য্যন্ত দেহ-মন তাহার কি রকম যে করিতে লাগিল তাহার উপমা নাই। আজ সকাল-বেলাতেই ক্ষেত্রমোহনের আসিবার কথা, কিন্তু সে ভুলিয়াই গেল, কিম্বা

কোন একটা কাজে আবদ্ধ হইয়া রহিল, সহসা এই আশঙ্কাই যেন তাহার সকল আশংকাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিল। সে আসিয়া পড়িলে যা হোক একটা মীমাংসা হইয়া যায়। এইটাই তাহার একান্ত প্রয়োজন। অধৈর্য্যের উত্তেজনায় তাহার কেবলই ভয় করিতে লাগিল পাছে আপনাকে আর সে ধরিয়া না রাখিতে পারে, পাছে নিজেই ছুটিয়া গিয়া উষাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে কাল ক্ষেত্রমোহনের সহিত তাহার কি কথা হইয়াছে। শৈলেশ নিজেকে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময় যখন আর কাটে না, এমনি সময়ে দ্বারের ভারি পর্দ্দা সরাইয়া যে ব্যক্তি সহসা প্রবেশ করিল সে একান্ত প্রত্যাশিত ক্ষেত্রমোহন নয়—অবিনাশ। শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া একখানা বই টানিয়া লইল। তাহার সর্ব্ব দেহে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল।

অবিনাশ বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যগুলার প্রতি চোখ পড়িতে ও-ধারের একখানা চেয়ার আরও খানিকটা দূরে টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। গৃহস্বামী অভ্যর্থনা করিবে এ ভরসা বোধ করি তাহার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢোকার একটা কারণ পর্য্যন্তও যখন সে জিজ্ঞাসা করিল না তখন অবিনাশ নিজেই কথা কহিল। বলিল, এই আড়াইটার গাড়ীতেই ত দিদি যেতে চাচ্চেন।

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, চাচ্চেন? কেন, আমার পক্ষ থেকে কি তিনি বাধা পাবার আশঙ্কা করচেন?

অবিনাশ ছেলেমানুষ, সে হঠাৎ কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, আজ্ঞে, না।

দরজার বাহিরে চুড়ির শব্দ পাইয়া শৈলেশের মন আরও বাঁকিয়া গেল। বলিল, না, আমার তরফ থেকে তাঁর যাবার কোন নিষেধ নেই।

অবিনাশ নীরব হইয়া রহিল। শৈলেশ প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার আসবার কথা ছিল শুনেছিলুম, তিনি এলেন না কেন?

অবিনাশ সংকুচিত ভাবে আস্তে আস্তে বলিল, তাঁর আমাকে পাঠাবারও তেমন ইচ্ছে ছিল না।

কেন?

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিল, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে সব কথা বলাও যায় না, বলে লাভও নেই। তবে তোমার দাদা যদি কখনো জান্‌তে চান্‌ ত ব'লো যে, এ ব্যাপারে উষার দোষ নেই, দোষ কিম্বা ভুল যদি কারও হয়ে থাকে ত সে আমার। তাঁকে আন্‌তে পাঠানোই আমার উচিত হয় নি।

একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, মনে হ'তো বাবা অন্যায় করে গেছেন। দীর্ঘকাল পরে অবস্থাবশে যখন সময় এলো ভাবলুম এবার তার প্রতিকার হবে। তোমার দিদি এলেন বটে কিন্তু এক দোষ শত দোষ হয়ে দেখা দিলে।

ইহার আর উত্তর কি! অবিনাশ মৌন হইয়া রহিল, এবং এম্‌নি সময়ে সহসা অন্য দিকের দরজা ঠেলিয়া ঘরে ক্ষেত্রমোহন

প্রবেশ করিলেন। শৈলেশ চাহিয়া দেখিল কিন্তু থামিতে পারিল না। কঠিন বাক্যের স্বভাবই এই যে, সে নিজের ভারেই নিজে কঠিনতর হইয়া উঠিতে থাকে। ঊষা অন্তরালে দাঁড়াইয়া; অভ্রান্ত-লক্ষ্যে তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিবার নির্দ্দয় উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈলেশ বলিতে লাগিল, তোমার ভগিনীকে একদিন বিবাহ করেছিলুম সত্য, কিন্তু সহধর্ম্মিণী তাঁকে কোনমতেই বলা চলে না। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমাজ ধর্ম্ম কিছুই এক নয়— জোর করে তাকে গৃহে রাখ্‌তে নিজের বাড়িটাকে যদি স্মৃতি-শাস্ত্রের টোল বানিয়েও তুলি, কিন্তু আমার একমাত্র ছোট বোন দুঃখে ক্ষোভে পর হয়ে যায়, একটি মাত্র ছেলে কুশিক্ষায় কুদৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ ত কোন ক্রমেই আমি হতে দিতে পারি নে। তবে তাঁর কাছে আমি এই জন্যে কৃতজ্ঞ যে, মুখ-ফুটে আমি যা বলতে পারছিলুম না, তিনি নিজে থেকে সেই দুরূহ কর্ত্তব্যটাই আমার সম্পন্ন করে দিলেন!

ক্ষেত্রমোহন বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। শৈলেশ লাজুক দুর্ব্বল স্বভাবের লোক, ভয়ংকর কিছু উচ্চারণ করা তাহার একান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু উন্মাদের মত সে এ কি করিতেছে! ঊষার ছোট ভাই লইতে আসিয়াছে এ সম্বাদ তিনি ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, অতএব অপরিচিত লোকটি যে সে-ই তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহারই সম্মুখে এ সব কি! ক্ষেত্রমোহন ব্যগ্র-অনুনয়ে হাত দুটি প্রায় জোড় করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, দেখবেন, আপনার দিদিকে যেন এসব ঘূণাগ্রেও জানাবেন না! অপরিচিত ছেলেটি

দ্বারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে কিছুই জানাতে হবে না, বাইরে দাঁড়িয়ে দিদি নিজের কানেই সমস্ত শুনতে পাচ্চেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে? ওইখানে?

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি জবাব দিবার পূর্ব্বেই শৈলেশ স্পষ্ট করিয়া বলিল, হাঁ, আমি জানি ক্ষেত্র, তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে।

উত্তর শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্তব্ধ বিবর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেইদিন ঘণ্টা দুই-তিন পরে ভগিনীকে লইয়া যখন অবিনাশ ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল, তখন সোমেন তাহার পিসির বাড়িতে, তাহার পিতা কলেজ গৃহে এবং ক্ষেত্রমোহন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে বসিয়া।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া বিভা স্বামীকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কি করচেন দেখ্‌লে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, দেখ্‌লুম ত হাতে আছে একখানা বই, কিন্তু আসলে করছেন বোধ করি অনুশোচনা।

এ কাজটা তুমি কবে করবে?

কোন্‌টা? বই, না অনুশোচনা?

বিভা কহিল, বই তোমার হাতে আর মানাবে না, আমি শেষের কাজটাই বল্‌চি।

ক্ষেত্রমোহন খোঁচা খাইয়া বলিলেন, ভাইকে ডেকে বাপের-বাড়ি চলে গেলেই বোধহয় করতে পারি।

বিভার মন আজ প্রসন্ন ছিল, সে রাগ করিল না। কহিল, ও

কাজটা আমি বোধ হয় পেরে উঠ্‌ব না। কারণ হিঁদুয়ানীর জপ-তপ এবং ছুঁই ছুঁই করার বিদ্যেটা ছেলে-বেলা থেকেই শিখে ওঠবার সুবিধে পাই নি।

স্ত্রীর কথায় ক্ষেত্রমোহন আজকাল প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন, এখন কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন, তোমার অতিবড় দুর্ভাগ্য যে ও-সুযোগ তুমি পাও নি। পেলে হয়ত এতবড় বিড়ম্বনা তোমার দাদার অদৃষ্টে আজ ঘট্‌ত না। এই বলিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

১৪

ভবানীপুরের সেই সুশিক্ষিতা পাত্রীটিকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইল, শুধু বিভা এবার স্বামীর আন্তরিক বিরাগের ভয়ে তাহাতে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি নানা প্রকারে দেখাইতে বিরত রহিল না। কন্যাপক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রমোহন একদিন সোজা-সুজি প্রশ্ন করিলে শৈলেশ অস্বীকার করিয়া সহজ ভাবেই কহিল, জীবনের অধিকাংশই ত গত হয়ে গেল ক্ষেত্র, বাকি কটা দিনের জন্যে আর নতুন ঝঞ্ঝাট মাথায় নিতে ভরসা হয় না। সোমেন আছে, বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর তোমরা, সে বেঁচে থাক, এ সবে আমার আর কাজ নেই।

মানুষের অকপট কথাটা বুঝা যায়, ক্ষেত্রমোহন মনে মনে আজ বেদনা বোধ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি আদালতের

ফেরত প্রায়ই আসিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহিণী নাই, সন্তান নাই, গোটা-তিনেক চাকরে মিলিয়া সংসার চালাইতেছে—দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়িটা এমনি বিশৃঙ্খল ছন্নছাড়া মূর্ত্তি ধারণ করিল যে ক্লেশ অনুভব না করিয়া পারা যায় না। প্রায় মাসাধিক কাল পরে সে সেই কথারই পুনরুত্থান করিয়া কহিল, তুমি ত মনের ভাব আমার জান শৈলেশ, কিন্তু কেউ একজন বাড়িতে না থাকলে বাঁচা কঠিন। বিশেষ বুড়ো বয়সে—

উমা আজ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, বয়সের এখনো ঢের দেরি, এবং তার ঢের আগেই বৌদি এসে হাজির হবেন। রাগ ক'রে মানুষে আর কতকাল বাপের বাড়ি থাকে? এই বলিয়া সে একবার দাদার মুখের প্রতি ও একবার শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু দুজনের কেহই জবাব দিল না। বিশেষতঃ শৈলেশের মুখ যেন সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু উমা চাহিয়াই আছে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ পরে শুধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, তিনি আর আস্‌বেন না।

উমা অত্যন্ত অবিশ্বাসে জোর করিয়া বলিল, আস্‌বেন না? নিশ্চয় আস্‌বেন। হয়ত এই মাসের মধ্যেই এসে পড়তে পারেন। হাঁ দাদা, পারেন না?

ফিরিয়া আসা যে কত কঠিন দাদা তাহা জানিতেন। যাবার পূর্ব্বে শৈলেশের মুখের প্রত্যেক কথাটি তাঁহার বুকে গাঁথা হইয়াছিল, উষা কোনদিন যে সে সকল বিস্মৃত হইতে পারিবে তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। বধূর প্রতি শৈলেশের পিতা

অপরিসীম অবিচার করিয়াছে; ফিরিয়া আসার পরে বিভা ঈর্ষাবশে বহুবিধ অপমান করিয়াছে এবং তাঁহার চূড়ান্ত করিয়াছে শৈলেশ নিজে, তাহার যাবার দিনটিতে। তথাপি হিন্দু নারীর শিক্ষা ও সংস্কার, বিশেষ ঊষার মধুর চরিত্রের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়াটা ক্ষেত্রমোহন কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না। এই কথা মনে করিয়া তাঁহার যখনই কষ্ট হইত, তখনই এই বলিয়া তিনি আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিতেন যে, ঊষা নিজের প্রতি অনাদর অবহেলা সহিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যখন তাহার ধর্ম্মাচরণে ঘা দিল, সে আঘাত সে সহিল না। বোধ করি এই জন্যই বহুদিন পরে একদিন যখন তাহার স্বামী-গৃহে ডাক পড়িল তখন এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু অভিমান করে নাই, নিঃশব্দে এবং নির্বিচারে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হিন্দু-রমণীর এই ধর্ম্মাচরণ বস্তুটির সহিত সংস্কার-মুক্ত ও আলোক-প্রাপ্ত ক্ষেত্র-মোহনের বিশেষ পরিচয় ছিল না, এখন নিজের বাড়ির সংগে তুলনা করিয়া আর একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা আপনাকে বঞ্চিত করিবার শক্তি দেখিয়া তাঁহার নিজেদের সমস্ত সমাজটাকেই যেন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হইত। তিনি মনে মনে বলিতেন এতখানি সত্যকার তেজ ত আমাদের কোন মেয়ের মধ্যেই নাই। তাহার আশঙ্কা হইত বুঝি সত্যকার ধর্ম্ম-বস্তুটাই তাহাদের মধ্যে হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গেছে। যে বিশ্বাস আপনাকে পীড়িত করিতে পিছাইয়া দাঁড়ায় না, শ্রদ্ধার গভীরতা যাহার দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়া আপনাকে যাচাই করিয়া লয়, এ বিশ্বাস কই

বিভার? কই উমার? আরও সে ত অনেককেই জানে, কিন্তু কোথায় ইহার তুলনা? ইহারই অনুভূতি একদিকে সংকোচ ও আর একদিকে ভক্তিতে তাহার সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ করিয়া দিতে থাকিত। কারণ এই কয়টা দিনের মধ্যেই স্বামীকে যে ঊষা কতখানি ভালবাসিয়াছিল এ কথা ত তাহার অবিদিত ছিল না। আবার পরক্ষণেই যখন মনে হইত, সমস্ত ভাসিয়া গিয়া এত বড় কাণ্ড ঘটিল কিনা শুধু একজন মুসলমান ভৃত্য লইয়া—যে আচার সে পালন করে না, বাটীর মধ্যে তাহারই পুনঃ প্রচলন একেবারে তাহাকে বাড়ি ছাড়া করিয়া দিল। অপরে যাই কেন না করুক, কিন্তু বৌঠাকরুণকে স্মরণ করিয়া ইহারই সংকীর্ণ তুচ্ছতায় এই লোকটি যেন একেবারে বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

উমা প্রশ্ন করিয়া মুখপানে চাহিয়াই ছিল, জবাব না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, হাঁ দাদা বল্‌লে না?

কি রে?

উমা কহিল, বেশ। আমি বল্‌ছিলুম বৌদি হয়ত এই মাসেই ফিরে আস্‌তে পারেন। তোমার মনে হয় না দাদা?

ভগিনীর প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যদি ধরাই যায় তিনি আস্‌বেন না! বহুকাল তাঁর না এসেই কাটছিল, বাকিটাও না এসে কাটতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি অন্য উপায় নেই? আমি সেই কথাই বলচি।

উমা ঠিক বুঝিল না, সে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

শৈলেশ তাহার বিস্মিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত, করিয়া কহিল, তাঁর ফিরে আসা আমি সঙ্গত মনে করি নে উষা! তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সহধর্ম্মিণী তাঁকে আমি বলতে পারি নে।

উষার বিরুদ্ধে এই অভদ্র ইঙ্গিতে ক্ষেত্রমোহন মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, ধর্ম্মই নেই আমাদের তা আবার সহধর্ম্মিণী! ওসব উচ্চাঙ্গের আলোচনায় কাজ নেই ভাই, আমি সংসার চালাবার মত একটা ব্যবস্থার প্রস্তাব করচি।

শৈলেশ গভীর বিস্ময়ে কহিল, ধর্ম্ম নেই আমাদের?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, কোন্‌খানে আছে দেখাও? রোজগার করি, খাই-দাই থাকি, ব্যস্‌। আমাদের সহধর্ম্মিণী না হলেও চলে। তখনকার লোকের ছিল শ্রাদ্ধ-শান্তি, পুজো-পাঠ, ব্রত-নিয়ম, ধর্ম্ম নিয়েই মেতে থাকত, তাদের ছিল সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। আমাদের অত বায়নাক্কা কিসের?

শৈলেশ মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, সহধর্ম্মিণী তাই? শ্রাদ্ধ-শান্তি পুজো-পাঠ—

কথা তাহার শেষ হইল না, ক্ষেত্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাই ভাই তাই, তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়! তুমিও হিঁদু, আমিও হিঁদু—without offence—পুজোও করি নে, মন্দিরেও যাই নে, কেষ্ট বিষ্টুকে ধরে খোঁচাখুঁচি করার কুঅভ্যাসও আমাদের নেই—মেয়েরা ত আরও harmless, আমরা সহজ মানুষ—লোক ভাল। কি হবে ভাই আমাদের অত বড় পাঁচ সাতটা অক্ষরের সহধর্ম্মিণী নিয়ে, ছোট্ট একটু স্ত্রী হলেই আমাদের খাসা চলে যাবে। তুমি

ভাই দয়া করে একটু রাজী হও—ভবানীপুরের ওঁরা ভারি ধরেছেন—তোমার বোনটিরও ভয়ানক ইচ্ছে, কথাটা রাখো শৈলেশ।

শৈলেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করচ ক্ষেত্র!

ব্যাপার দেখিয়া উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রমোহন ভীত হইয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, না ভাই শৈলেশ, না। যদি ওরকম কিছু করেও থাকি, তোমার চেয়ে আমাকেই আমি বেশি করেছি।

শৈলেশ প্রতিবাদ করিল না, কেবল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১৫

কথাটাকে আর অধিক ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে শান্ত হইবার পাঁচ-সাত দিন সময় দিয়া আর একদিন ফিরিয়া আসিয়া তখন ভবানীপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু সপ্তাহ গত না হইতেই ছাপরা কোর্টে হঠাৎ একটা মকদ্দমা পাওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। যাইবার পূর্বে পাত্রী-পক্ষ ও পাত্র-পক্ষের তরফে বিভাকে আশা দিয়া গেলেন যে, কেস যতটা হোপলেস মনে হইতেছে

বস্তুতঃ, তাহা নয়। বরঞ্চ, মাছ চারের দিকেই ঝুঁকিতেছে, হঠাৎ টোপ গিলিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকদিন পরে স্ত্রীর সহিত আজ তাঁহার সদ্ভাবে বাক্যালাপ হইল। উষার মুখে বিভা কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, আমি মনে করতুম উষাবৌদিদির তুমি পরম বন্ধু, তুমি যে আবার দাদার বিয়ের উদ্যোগ করতে পারো, মাস-খানেক আগে এ কথা আমি ভাবতেও পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মাস-খানেক পূর্ব্বে কি আমিই ভাবতে পারতুম? কিন্তু এখন শুধু ভাবা নয়, উচিত বলেই মনে হয়। উষা বৌঠাকরুণের বন্ধু আমি এখনও, এবং চিরদিন তাঁর শুভ কামনাই করব, কিন্তু যা হবার নয়, হয়ে লাভ নেই, তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরলেই বা ফল কি।

বিভা অতি-বিজ্ঞের চাপা-হাসি দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, তোমরা পুরুষমানুষ বলেই বোধ হয় বৌঠাকরুণটিকে বুঝতে এত দেরি হ'ল, আমি কিন্তু দেখবামাত্রই তাঁকে চিনেছিলুম। তাঁকে নিয়ে আমরা চলতে পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, সে ত চোখেই দেখতে পেলুম বিভা, তাঁকে সরে পড়তে হ'ল, এবং তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বোঝবার পার্থক্য ঘটেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু অন্য রকমের হ'লে আজ জিনিসটা কি দাঁড়াত এখন সে আলোচনা বৃথা, তবে এ কথা তোমার মানি, ভুল আমার একটু হয়েছিল।

বিভা কহিল, যাক্, তা হলেই হ'ল। জপ-তপ আর হিঁদুয়ানীর

সুখ্যাতিতে হঠাৎ যে রকম মেতে উঠেছিলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। আমরাও মুসলমান খৃস্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোট, হাতে খেলে-ছুঁলেই জাত যাবে এ দর্প কেন? শুধু ভট্টাচায্যিগিরি ছাড়া আর সব রাস্তাই নরকে যাবার, এ ধারণা তাঁর বাপের বাড়িতে চল্‌তে পারে, কিন্তু এখানে পারে না। আর পারে না বলেই ত স্বামীর আশ্রয়ে তাঁর স্থান হ'ল না।

কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়! এমন করিয়া সত্য-মিথ্যার জড়ানো বলিয়া ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, জবাব দিতে পারিলেন না।

এই সময়ে উমা ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

বিভা তাহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, শুধু আপনার জাত বাঁচিয়ে যাওয়াটাই কি বৌদিদির সবচেয়ে বড় হ'ল? ধর, তোমার নালিশটা যদি সত্যি হয়, আমার জন্যে দাদা যদি তাঁকে অপমান করেই থাকেন, তেম্‌নি অপমান কি তাঁর জন্যে তুমি আমাকে কর নি? তাই বলে কি তোমাকে ছেড়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো? এই কি তুমি বল?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, না, তা আমি বলি নে!

বিভা কহিল, বল্‌তে পারো না আমি জানি। উমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার দাদা হঠাৎ একটা নতুন জিনিসের বাইরেটা দেখেই মজে গিয়েছিলেন। হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামীর শিক্ষা আমরা পাই নি, কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে যা পেয়েছিলুম সে ঢের ভদ্র

চের সত্য। একটু হাসিয়া কহিল, তোমার দাদার ভারি ইচ্ছে ছিল বৌঠাকরুণের কাছে থেকে তুমি অনেক কিছু শেখো। বসে শোনবার এখন সময় নেই ভাই, কিন্তু কি কি তাঁর কাছে শিখলে আর কি-ই বা বাকি রয়ে গেল, তোমার দাদাকে না হয় শোনাও। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট ভগিনীর সম্মুখে স্ত্রীর হাতের খোঁচা তাহাকে বেশি করিয়াই বিঁধিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিলেন না। হিঁদুয়ানীর অনেকখানি হইতেই তাহারা ভ্রষ্ট, কিন্তু মেয়েদের আচার-নিষ্ঠা, সাবেক দিনের জীবন-যাত্রার ধারা কল্পনায় তাহাকে অতিশয় আকর্ষণ করিত। এই জন্যই চোখের উপরে অকস্মাৎ উষাকে পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাহারই আচরণে আজ সকলের কাছে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেছে। এই বধূটিকেই কেন্দ্র করিয়া সে যে-শিক্ষা সংস্কারের কথা আত্মীয়-পরিজন মধ্যে মেয়েদের কাছে সগর্ব্বে বার বার বলিত, সেইখানেই তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। নিজের জন্য উষা নিজেই শুধু দায়ী, তাহার অন্যায় আর কিছুই স্পর্শ করে নাই—করিতেও পারে না, এই কথাটা তিনি জোর দিয়া বলিতে চাহিলেও মুখে তাঁহার বাধিয়া যাইত। তাই স্ত্রী চলিয়া গেলে, তিনি উমার কাছে কতকটা জবাব-দিহির মতই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, গোঁড়ামি সকল জিনিসেরই মন্দ, এ আমি অস্বীকার করি নে উমা—হিঁদুয়ানীর এই গলদটাই ঘুচানো চাই—কিন্তু আমরা যে আরও মন্দ এ কথা অস্বীকার করলে ত আরও অন্যায় হবে।

দাদা ও বৌদিদির বাদ্-বিতণ্ডার আলোচনায় উমা চিরদিনই মৌন হইয়া থাকিত, বিভার অনুপস্থিতেও তাই এখনও নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

সেই রাত্রে ছাপ্‌রা যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রমোহন বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার ফিরতে বোধ করি চার-পাঁচদিন দেরি হবে, ইতিমধ্যে ভবানীপুরে ওদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, ব'লো, শৈলেশকে সম্মত্ করতে আমি পারব।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠাক্‌রুণ তা হলে আর ফিরলেন না ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, না। যতই ভাবচি মনে হচ্চে শৈলেশের চেয়ে তাঁর অপরাধ বেশি। ঠিক কথাই বলেচ। যে শিক্ষায় মানুষকে এত বড় সংকীর্ণ এবং স্বার্থপর ক'রে তোলে, সে শিক্ষার মূল্য এককালে যতই থাক্ এখন আর নেই। অন্ততঃ আমাদের মধ্যেই তার আর পুনঃ প্রচলনের আবশ্যকতা নেই। তাই বটে। বৌঠাক্‌রুণের আচার-বিচারে বিড়ম্বনাই ছিল, বস্তু কিছু ছিল না। থাক্‌লে গৃহাশ্রয় ত্যাগ করতেন না। আচ্ছা, চল্‌লুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

মফঃস্বলের মকদ্দমা সারিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার পাঁচদিনের বদলে দিন-দশেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীতে পা দিয়া প্রথমেই দেখা মিলিল উমার। সে-ই খবর দিল যে, দিন-দুই পূর্ব্বে মাস-ছয়েকের ছুটি লইয়া শৈলেশবাবু আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সোমেনকে স্কুল ছাড়াইয়া এবার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এমন হঠাৎ যে ?

উমা কহিল, কি জানি। সামেনকে নিতে এসেছিলেন, বল্‌লেন, শরীর ভাল নয়।

বিভা ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শরীর ভাল না থাক্‌বারই কথা, কিন্তু সারবার ব্যবস্থা ও নয়। আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

১৬

আরও পাঁচটা জুনিয়র ব্যারিস্টারের যে ভাবে দিন কাটে ক্ষেত্রমোহনের দিনও তেম্‌নি কাটিয়া যাইতে লাগিল। হাতে টাকার টান পড়িলে হিঁদুয়ানী ও সাবেক চাল-চলনের অশেষ প্রশংসা করেন আবার অর্থাগম হইলেও চুপ করিয়া যান—যেমন চলিতেছিল তেম্‌নি চলে। শৈলেন্দ্রের তিনি বাস্তবিকই শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহাকে চিনিতেন, তাহার মত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষকে দিয়া প্রায় সব কাজই করানো যায়, এই মনে করিয়া তিনি ভবানীপুর এখনও হাত ছাড়া করেন নাই। তাহাদের এই বলিয়া ভরসা দিতেন যে, পশ্চিম হইতে ঘুরিয়া আসার যা বিলম্ব। বৌঠাকুরুণকে তিনি এখনও প্রায় তেম্‌নি স্নেহ করেন, তেম্‌নি শ্রদ্ধাই প্রায় এখনো তাঁহার প্রতি আছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কাজ নাই। যেখানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, ধর্ম্ম-জীবনের তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক, কিন্তু শৈলেশের গৃহস্থালীর মধ্যে আর

নয়। নিজের একটা ভুল এখন প্রায়ই মনে হয়, স্বামীকে উষা ভালবাসিতে পারে নাই, পারাও কখনো সম্ভব নয়। ছেলে-বেলা হইতে কড়া রকমের আচার-বিচারের ভিতর দিয়া ধাতটা তাহার কড়া হইয়াই গেছে, সুতরাং ইহকালের চেয়ে পরকালই তাহার বেশি আপনার। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাই এত সহজ হইয়াছে। তাহার নিজের মধ্যে যে স্বামী ছিল, উষার এই আচরণে সে যেমন ভীত, তেমনি ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার মনে হইত সোমেনকে যে সে এত সত্বর ভালবাসিয়াছিল, সেও কেবল সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কড়া কর্ত্তব্যের দিক দিয়া। সত্যকার স্নেহ নয় বলিয়াই যাবার দিনটিতে তাহার কোথাও কোন টান লাগে নাই।

এম্‌নি ভাবেই যখন কলিকাতায় ইহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন মাস-দুই পরে সহসা এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে, এবং নিজে এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাস্নান একটা দিনের জন্যও পিতাপুত্রের বাদ যাইবার যো নাই, এবং মাছ মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটে না।

শুনিয়া উমা চুপি চুপি হাসিতে লাগিল, বিভা কহিল, তামাসাটি কে করলেন? যোগেশবাবু?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, খবর যোগেশবাবুর কাছ থেকেই এসেছে সত্যি, কিন্তু তামাসা করবার মত ঘনিষ্ঠতা তাঁর সংগে নেই।

বিভা কহিল, দাদার বন্ধু ত, দোষ কি? একটু থামিয়া বলিল,

কেন জানো? বৌদিদির সমস্ত ব্যাপার দাদার কাছেই শুনেছেন, এবং এত লোকের মাঝখানে তুমিই তাঁর গোঁড়ামির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে—তাই এ রসিকতাটুকু তোমার পরেই হয়েছে। সহাস্যে বলিতে লাগিল, কেস্ আরম্ভ করবার সময় মাঝে মাঝে বুদ্ধিটা যদি আমার কাছে নাও ত মকদ্দমা বোধ হয় তোমাকে এত হারতে হয় না। উমা, আজ একটু চট পট তৈরি হয়ে নাও, সাতটার মধ্যে পেঁছিতে না পারলে কিন্তু লাবণ্য রাগ করবে। তোমার দাদাটিকে আড়ালে ডেকে একটু বলে দিয়ো ভাই, ঠেক্‌লে যেন এখন থেকে কন্‌সল্ট করেন। পয়সা যারা দেয় তারা খুসি হবে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবুর হঠাৎ ঠাট্টা করার হেতুটা যে বৌদিদি ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা সে বুঝিল।

ইহার দিন পাঁচ-ছয় পরে, একখানা মস্ত চিঠি আনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যোগেশবাবুর বাবার লেখা। বয়স সোত্তর-বায়াত্তর—চাক্ষুষ আলাপ নেই, চিঠি-পত্রেই পরিচয়। লোক কেমন ঠিক জানি নে, তবে এটা ঠিক জানি যে ঠাট্টার সম্বাদ আমার সঙ্গে তাঁর নেই।

দীর্ঘ পত্র, বাঙলায় লেখা। আদ্যোপান্ত বার-দুই নিঃশব্দে পড়িয়া বিভা মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি? তোমাকে ত একবার যেতে হয়?

কিন্তু আমার ত এক মিনিটের সময় নেই।

বিভা কহিল, সে বল্‌লে হবে না। এ বিপদে আমরা না গেলে আর যাবে কে? এ চিঠির অর্দ্ধেকও যদি সত্যি হয়, সে যে ঘোরতর বিপদ তাতে ত আর এক বিন্দু সন্দেহ নেই!

ক্ষেত্রমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু যাই কি করে? এবং গেলেই যে বিপদ কাটবে তারই বা ঠিকানা কি!

দুজনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশের দ্বারা সমস্তই সম্ভব। মনের জোর বলে যে বস্তু, সে তার একেবারে নেই। মরুক গে সে, কিন্তু দুঃখ এইটুকু যে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও সে বিগড়ে তুল্‌চে। যেমন করে পারো এইখানে তোমার বাধা দেওয়া চাই।

বিভা বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কান্নাকাটি, অভিমান সমস্তই করিতে পারে, কিন্তু ঠেকাইবার সাধ্য তাহার নাই, তাহা সে মনে মনে জানিত। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু একটি জিনিস আমি নিশ্চয় ধরেছি, বিভা, ঊষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসে নি। এ সব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।

বিভা রাগ করিল। কহিল, তাই, এম্‌নি ক'রে তাঁর মন পাবার চেষ্টা কর্‌চেন? দেখ, দাদা আমার দুর্ব্বল হতে পারেন, কিন্তু ইতর নন। কারও জন্যেই এই সঙ্‌ সাজার ফন্দি তাঁর মাথায় আসবে না।

এই প্রতিক্রিয়া বস্তুটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার বিভা তাহার কি জানে? শব্দটা শুধু ক্ষেত্রমোহন বইয়ে পড়িয়াছেন; তিনিও ইহার বিশেষ কিছু জানেন না, তাই স্ত্রীর ক্রোধের প্রত্যুত্তরে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অন্ধকারে তর্ক-যুদ্ধ চালাইতে তাঁহার সাহস হইল না।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক্ কাজের বেলায় বিভাই জয়ী হইল। স্বামীকে দিন-দুয়ের মধ্যেই কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া এলাহাবাদ রওনা হইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি অপ্রিয়। যোগেশবাবুর বাটীর কাছেই বাসা, কিন্তু শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরু-ভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে, দেখা হইয়াছে সোমেনের সংগে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্রসংগত আচার-বিচার, স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল সন্ধ্যায় বোধ করি ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখাইয়া যান। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমাকে দেখে সে বেচারার দু'চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগলো, তার চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন খাবার কষ্টটাই তার বেশি হয়েছে।

এই ছেলেটির প্রতি বিভার এক প্রকারের স্নেহ ছিল, তাহা অত্যন্ত বেশি না হইলেও বিদেশে দুঃখ পাইতেছে শুনিয়া সে সহিতে পারিল না। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তাকে জোর করে নিয়ে এলে না কেন?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ইচ্ছা যে হয় নি তা নয়, কিন্তু ভেবে

দেখলুম তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুফল ফল্‌বে না ! ধর্ম্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি। শৈলেশ আমাদের ওপর ঢের বেশি বেঁকে যেত।

বিভা চোখ মুছিয়া কহিল, এত ব্যাপার ঘটেছে, জান্‌লে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যেতুম।

১৭

চিঠি লেখা-লেখি একপ্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, তথাপি কলিকাতায় আত্মীয় বন্ধুমহলে শৈলেশের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কথা প্রচারিত হইতে বাধে নাই ! হয়ত বা স্থানে স্থানে বিবরণ একটু ঘোরালো হইয়াই রটিয়াছিল। ভবানীপুরে এ সম্বাদ যে গোপন ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। লজ্জায় বিভা মুখ দেখাইতে পারিত না, শুধু স্বামীর কাছে সে দম্ভ করিয়া বলিত, দাদা আগে ফিরে আসুন। আমার সুমুখে কি ক'রে এ-সব করেন আমি দেখবো !

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া থাকিতেন। বিভার দ্বারা বিশেষ কিছু যে হইবে তাহা বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু সমাজের সমবেত মর‍্যাল প্রেসরের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। দুর্ব্বল চিত্ত শৈলেশ হয়ত তাহা বেশি দিন ঠেকাইতে পারিবে না, এ ভরসা তিনি করিতেন।

এদিকে শৈলেশ আরও মাস-চারেক ছুটি বাড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাও শেষ হইতে আর মাস-দুই বাকি। চাক্‌রি ছাড়িতে সে পারিবে না, তাহা নিশ্চয়। গঙ্গাস্নান ও ফোঁটা-তিলক যতই কেন

না সে প্রয়াগে বসিয়া করুক, শ্রীগুরুর ও গুরু-ভাইয়ের দল এ কুমতলব তাহাকে প্রাণ গেলেও দিবে না। তারপরে ফিরিয়া আসিলে একবার লড়াই করিয়া দেখিতে হইবে।

সেদিন চা খাইতে বসিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এবার কিন্তু উষা বৌঠাকরুণ এলে তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাইকে ডাকিয়ে, আর বাপের বাড়ি পালাবার ফন্দি করতে হবে না। জপ-তপের মধ্যে দুজনের বনবে।

বিভার মুখ মলিন হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আসার কথা তুমি শুনেচ নাকি?

না।

বিভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, পাড়া-গাঁয়ে শুনেচি নানারকমের তুকতাক আছে, আচ্ছা তুমি বিশ্বাস কর?

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, না। যদিও বা থাকে, তিনি এ সব করবেন না।

কেন করবেন না?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুণের ওপর আমি খুসি নই, তাঁর প্রতি আমার সে শ্রদ্ধাও আর নেই, কিন্তু এই সব হীন কাজ যে তিনি করতেই পারেন না তা তোমাকে আমি দিব্যি করে বলতে পারি।

বিভা ঠিক বিশ্বাস করিল না। শুধু ধীরে ধীরে কহিল, যার যা ইচ্ছে হোক, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কেড়ে আনবই, তোমাকে এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বললুম।

বেহারা আসিয়া খবর দিল, বন্ধু দুখানা বড় কার্পেট চাহিতে আসিয়াছে। বন্ধু শৈলেশের অনেক দিনের ভৃত্য; বিভা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সে কার্পেট নিয়ে কি করবে? বলিতে বলিতে উভয়েই বাহিরে আসিতেই বন্ধু সেলাম করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল।

কার্পেটে হবে কি বন্ধু?

কি জানি মেমসাহেব, গান-বাজনা না কি হবে।

করবে কে?

সাহেবের সঙ্গে তিন-চার জন লোক এসেছে, করবে বোধ হয় তারাই।

দাদা এসেছেন?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশ এসেছে?

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, কাল রাত্রে সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্পেট লইয়া সে প্রস্থান করিলে দুজনেই নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই দিনটা কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া ক্ষেত্রমোহন পরদিন বিকালে বিভা ও উমাকে সঙ্গে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যাসমত নিচের লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পড়িল। দরজার সেই ভারি পর্দাটা নাই, ভিতরের সমস্তই চোখে পড়িল। একটা দিনেই বাড়ির চেহারা বদলাইয়া গেছে। বইয়ের আলমারিগুলা আছে বটে, কিন্তু আর কোন আসবাব নাই। মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফর্সা জাজিম পাতিয়া জন-দুই লোক নধর

পরিপুষ্ট দেহের সর্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা পরিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ সাহেব মেম দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তিনজনে উপরে যাইতেছিলেন, উড়িয়া পাচক-ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়া কহিল, উপরের ঘরে গোঁসাইজি আছেন।

গোঁসাইজিটা কে?

পাচক ঠাকুর চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কোথায়?

উত্তরে সে উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলে, ক্ষেত্রমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়া শৈলেশ, শৈলেশ, করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ছুটিয়া আসিল সোমেন। হঠাৎ তাহার বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া বিভা কাঁদিয়া ফেলিল। পরণে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা, সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না। উমা ধরিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক্, অ-বেলায় আর ছুঁয়ে কাজ নেই। ও-বেচারাকে হয়ত আবার নাইয়ে দেবে। বাবা কোথায় সোমেন?

সোমেন কহিল, প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের কাছে বসে শ্রীভাগবত পড়চেন!

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম, শ্রীবাবাকে একবার খবরটা দাও।

তিনি খবর পেয়েছেন, আসচেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে খড়ম পায়ে শৈলেশ নিচে আসিল। থান কাপড়, গায়ে জামা নাই, মাথায় একটা সরু গোছের টিকি ছাড়া বাহিরের চেহারায় তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যে অনেক বদল হইয়া গেছে তাহা চক্ষের পলকেই চোখে পড়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাব, মৃদু কথা—উমা ও বিভা প্রণাম করিলে সে দূরে দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিল, স্পর্শ করিতে নিকটে আসিল না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাড়িতে একটু বসবার যায়গাও নেই নাকি হে ?

শৈলেশ লজ্জিত ভাবে কহিল, বাইরের ঘরটা নোঙ্‌রা হয়ে আছে—পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তা হলে এখনকার মত আমরা বিদায় হই। সোমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এখন চল্‌লুম। আমাদের বোধ করি আর বড একটা প্রয়োজন হবে না, তবু বলে যাই, বস্‌বার যায়গা যদি কখনও একটা হয় ত খবর দিস বাবা! চল।

শৈলেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীতে বিভা কাহারও সহিত একটা কথাও কহিল না, তাহার দুচক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া শুধু জল পড়িতে লাগিল। একটা কথা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আসিলেন ও-বাড়িতে তাঁহাদের আর স্থান নাই। দাদা যা'ই কেন না করুক, সোমেনকে সে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিবে বলিয়া বিভা স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। স্নেহের সেই দাম্ভিক উক্তি স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই

বার-বার মনে পড়িল, কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় ইহার আভাস পর্য্যন্তও কেহ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ইহার পরে মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কথাটা আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু সমাজে এমন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে যে, লোকে সত্যের মধ্যেও আর যেন আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। মুখে মুখে অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া সমস্ত জিনিসটা এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোথাও যাওয়া-আসাও বিভার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, অথচ কোনদিকে কোন রাস্তাই কাহারও চোখে পড়িতেছে না। ক্ষেত্রমোহন জানিতেন, সংসারে অনেক উত্তেজনাই কালক্রমে ম্লান হইয়া আসে, ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকাই তাহার উপায়, শুধু এই পরকালে লোভের ব্যবসাটাই একবার সুরু হইয়া গেলে আর সহজে থামিতে চাহে না। অনিশ্চিতের পথে এই অত্যন্ত সুনিশ্চিতের আশাই মানুষকে পাগল করিয়া যেন নিরন্তর ঠেলা দিয়া চালাইতে থাকে। ইহার উপরেও প্রচণ্ড বিভীষিকা উমা। বন্ধু ও শত্রুভাবে সর্ব্বনাশের বনিয়াদ গড়িয়া গেছে সে-ই। কোন মতে একটা খবর পাইয়া যদি আসিয়া পড়ে ত অনিষ্টের বাকি কিছু আর থাকিবে না। কেবল বিভাই নয়, তাহার উল্লেখে উমার, এমন কি ক্ষেত্রমোহনেরও আজকাল গা জ্বলিতে থাকে। বাস্তবিক তাহাকে না আনিলে ত এ বালাই কোন দিনই ঘটার সম্ভাবনা ছিল না।

আজ রবিবারে সকাল-বেলা স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া এই আলোচনাই করিতেছিলেন। সেই অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসার

দিন হইতে ইঁহারা সে-মুখোও আর হন নাই, কিন্তু সে-বাড়ির খবর পাইতে বাকি থাকিত না। গুরু-ভ্রাতার দল অদ্যাবধি নড়িবার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনেন না, এবং শ্রীগুরু ও গোঁসাই ঠাকুরাণী উপরের ঘরে তেমনি কায়েম হইয়াই বিরাজ করিতেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নাম-কীর্ত্তন অব্যাহত চলিয়াছে, ভোগাদির ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে, এ সকল সম্বাদ বন্ধুজনদের মুখে নিয়মিত ভাবেই বিভার কানে পেঁছে ; কেবল অতিরিক্ত একটা কথা সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা জায়গা লইয়া শৈলেশ গুরুদেবের আশ্রম তৈরি করার সংকল্প করিয়াছে, এবং এই হেতু অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।

বিভা মলিন মুখে কহিল, যদি সত্যই হয়, দাদাকে কি একবার বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না ? ছেলেটা কি চোখের সামনে ভেসেই যাবে ?

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করতে পারি বল ? বিভা চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া কি হইতে পারে সে তাহার কি জানে ?

ক্ষেত্রমোহন সহসা বলিয়া উঠিলেন, সেই পর্য্যন্ত ত আর কখনও যাই নি, আজ চল না একবার যাই ?

বিভার বুকের মধ্যেটা আজ সত্যই কাঁদিতেছিল, তাই বোধ হয় আজ তথায় মান-অভিমানের স্থান হইল না, সহজেই সম্মত হইয়া বলিল, চল।

উমাকে আজ তাহারা সংগে লইল না। এই মেয়েটির সম্মুখে

লজ্জার মাত্রাটা আজ আর তাহাদের বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না। মোটর যখন তাহাদের শৈলেশের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। বাহিরের ঘরটা আজ খোলা, গুরুভাই যুগল মেঝের উপরে বসিয়া একটা বড় পুঁটুলি কসিয়া বাঁধিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈলেশবাবু বাড়ি আছেন?

তাঁহারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শেষে উত্তর দিলেন, না, তিনি পরশু গেছেন নবদ্বীপ ধামে।

কবে ফিরবেন?

কাল কিম্বা পরশু সকালে।

বাবুর ছেলে বাড়িতে আছে?

তাঁহারা উভয়েই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, আছে, এবং তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেলেন।

অতঃপর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুজনের একসঙ্গেই চোখে পড়িল লাইব্রেরী-ঘরের দ্বারে সেই পুরানো ভারি পর্দ্দাটা আজ আবার ঝুলিতেছে। একটু ফাঁক করিতেই চোখে পড়িল পূর্ব্বের আসবাব-পত্র যথাস্থানে সমস্তই ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভা কহিল, ওই দুটো লোককে সরিয়ে দিয়ে দাদা আবার ঘরটার শ্রী ফিরিয়েছেন। এটুকু সুবুদ্ধিও যে তাঁর আর কখনও হবে আমার আশা ছিল না। কিন্তু বলা তাহার শেষ না হইতেই সহসা পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া

গেল। সোমেন বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, রবারের একটা বল লুফিতে লুফিতে আসিতেছে। কোথায় বা মালা, কোথায় বা টিকি আর কোথায় বা তাহার ব্রহ্মচারীর বেশ। খালি গা, কিন্তু পরণে চমৎকার লালপেড়ে জরি-বসানো ধুতি—মাথার চুল বাঙ্গালী-ছেলেদের মত পরিপাটি করিয়া ছাঁটা, পায়ে বার্ণিশ-করা পাম্পসু। সে ছুটিয়া আসিয়া বিভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, মা এসেছেন পিসিমা। রান্নাঘরে রাঁধচেন, চল। এই বলিয়া সে টানিতে লাগিল।

বিভা স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মা এসেছেন, না সোমেন? তাই ত বলি—

কাল দুপুর-বেলা এসেছে। চলুন পিসেমশাই রান্নাঘরে।

চল।

তিনজনে রন্ধনশালার সুমুখে আসিতেই ঊষা সাড়া পাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভা পায়ের জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল। কহিল, কি কাণ্ড হয়েছে দেখলে বৌদি?

ঊষা হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল। হাসিয়া কহিল, দেখলুম বই কি ভাই! ছেলেটার আকৃতি দেখে কেঁদে বাঁচি নে। তাড়াতাড়ি মালা-ফালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নাপ্‌তে ডাকিয়ে চুল কেটে দিই; নতুন কাপড়, জামা জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি। আচ্ছা আপনিই বা কি করছিলেন বলুন ত? এই বলিয়া সে কটাক্ষে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বলবার তাড়া-হুড়ো নেই বৌঠাকরুণ, ধীরে-সুস্থে সমস্তই বলতে পারব, এখন ওপরে চলুন, কিছু খেতে দিন। ভাল কথা, গুরুভাই ত দেখলুম বাইরে পুঁটুলি কস্‌চেন, কিন্তু শ্রীপ্রভুপাদ যুগল-মূর্ত্তির কি করলেন? ওপরে তাঁরা ত নেই?

উষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না, ভয় নেই, তারা নবদ্বীপ-ধামে গেছেন।

বলি, আবার ফিরে আস্‌চেন না ত?

উষা তেমনি মৃদু হাসিয়া শুধু কহিল, না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বৌঠাকরুণ, আপনার যে এরূপ সুবুদ্ধি হবে এ ত আমার স্বপ্নের অগোচর। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-কুমারের স্বহস্তে তুলসী মালা ছিঁড়ে দিয়ে টিকি কেটে দিয়ে—এ সব কি বলুন ত?

উষা হাসিমুখে ক্ষেত্রমোহনের কথা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, বেশ ত, বল্‌বার তাড়া-হুড়ো কি জামাইবাবু! ধীরে-সুস্থে বল্‌তে পারব। এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু আপনাদের খেতে দিই।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬